স্বনির্বাচিত

সেরা বারো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেরা বারো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রূপা প্রকাশনী
৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

অমলের পাখি

রাজপুত্তুরের অসুখ

নিউইয়র্কের সাদা ভাল্লুক

ছোটমাসির মেয়েরা

ডাকাতের পাল্লায়

দুষ্টু

সুশীল মোটেই সুবোধ বালক নয়

সাতজনের তিনজন

জলচুরি

ইংরিজির স্যার

সেই অদ্ভুত লোকটা

অন্ধকারে গোলাপ বাগানে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অমলের পাখি

হঠাৎ দরজা খুলে অন্তু বললে, 'এই দেখ অমল, সেই পাখিটা ধরেছি!'

অমল তখন একমনে বসে খাঁচা বানাচ্ছিল। অন্তুকে দেখে ওর মুখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললো, 'তুই ধরে ফেললি অন্তু! শুধু শুধু আমি এত কষ্ট করে খাঁচা বানালুম।'

অন্তু মুঠো করে পাখিটার দুটো ডানা চেপে ধরেছে। আনন্দে ওর চোখ দুটো দু-টুকরো রোদ্দুরের মত ঝকঝক করছে। আজ ওদের ইস্কুল ছুটি। গ্রামে কে যেন একজন মস্ত বড় মানুষ এসেছে সেইজন্য। সারা দুপুর বাগানে ঘুরে, এ গাছ সে গাছের মগ্ ডালে চড়ে অতিকষ্টে ধরেছে পাখিটাকে। অমল পাখিটা ধরবার চেষ্টা করেনি। আগে বসে বসে খাঁচা বানিয়েছে। যদিও পাখিটা অমলই প্রথম দেখেছিল।

—'এটা কি পাখি রে?' অন্তু জিজ্ঞেস করল।

—'জানি না', অমল বলল।

—'আমাকে পাখিটা দিবি?'

—'ইস্! কত কষ্ট করে ধরেছি, আর...'

অমল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পাখিটার দিকে। দূর থেকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল—কিন্তু পাখিটা যে এত সুন্দর—সে ভাবতেই পারেনি। দুধের মত সাদা রঙ, ঘুঘু পাখির চেয়ে একটু বড়, পায়রার চেয়ে একটু ছোট। টিয়া পাখির মতন দীর্ঘ বাঁকানো লাল ঠোঁট। পাখিটা যেন ভয় পেয়ে অবাক হয়ে গেছে। অমল এত সুন্দর পাখি আগে কখনও দেখেনি।

—'দে ভাই অন্তু পাখিটা আমাকে', অমল মিনতি করে বলল, 'তার বদলে তুই যা চাস দেব। আমার জলছবির খাতাটা নিবি, কিংবা এক ডজন কাচের গুলি, কিংবা রোদ্দুরের চশমাটা?'

—'না, চাই না, পাখি দেব না!' অন্তু সোজা জবাব দিয়ে দিল।

—'কিন্তু তোর তো খাঁচা নেই। তুই কোথায় রাখবি?'

—'যেখানে ইচ্ছে। আমি কি তোর মত পাখি না ধরেই খাঁচা বানাবো?'

—'আচ্ছা, পাখিটা একবার ধরতে দে।'

অমল কাছে এসে পাখিটার গায়ে হাত দিল। অমনি পাখিটা ঝটপট করে উঠতেই অন্তুর হাত ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা পাখি আনন্দে একবার

BanglaBook.org

সারা ঘরটা ঘুরে জানলা দিয়ে টুপ করে বেরিয়ে গেল। প্রথমে দুজনেই চমকে গিয়েছিল—তারপরই অমল অন্তু ছুটে বাইরে এল ঘর থেকে। রান্নাঘরের চালে বসেছে। সেখান থেকে তেঁতুলগাছের মাথায়। তারপর ফুরফুর করে উড়ে আরও দূরে চলে গেল।

ছুট্ ছুট্ ছুট্। ওরা দুজনে ছুটলো পাখির পিছু পিছু। পাখি উড়তে উড়তে এল ছোট খালটার পারে। তারপর কয়েকবার অদ্ভুত ডাক ডেকে চক্কর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চলে গেল খালের মাঝখানে। সেখানে একটা বজরা নৌকো ছিল। পাখিটা তার জানলা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল।

অমল আর অন্তু খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল বজরাটার দিকে তাকিয়ে। বজরা নৌকো একরকম ছোটখাট বাড়ির মত, তার ঘর আছে, ছাদ বারান্দা সব আছে। এ বজরাটা কার ওরা জানে না। গ্রামে নতুন এসেছে!

—'তোর জন্যই আমার পাখিটা উড়ে গেল।'

—'পাখিটা তোর কি, আমার। আমিই তো আগে দেখেছি। তা ছাড়া আমি ওর জন্য খাঁচা বানিয়েছি। তুই কি করেছিস ওর জন্যে?'

—'কষ্ট করে গাছে উঠে ধরল কে? তুই ধরতে পারতিস্?'

শেষের প্রশ্নে অমল একটু দমে গেল। ও গাছে উঠতে পারে না। গাছে ওঠা বারণ। গত বছর ওর খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল।

দুপুরবেলা চারিদিক নিঝুম। কোথাও জন-মানুষ নেই। বজরাটা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে একটা মাছরাঙা পাখি ঝুপ ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে।

—'চল ঐ বজরাটায় যাবি?' অন্তু বলল।

—'চল।'

দুজনে জামা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। অন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে, অমলও একেবারে খারাপ নয়। শান্ত জল ভেঙে ঝুপ ঝুপ করে ওরা এগুতে লাগল, ভারী সুন্দর দেখাল জলের মধ্যে ওদের কাঁচি শরীর। নীল আকাশ সকৌতুকে ওদের দেখতে লাগলো।

বজরা নৌকোতে উঠে দুজনে চুপি চুপি গায়ের জল নিঙড়ে নিল। একটু ভয়-ভয় করতে লাগল ওদের। কি করবে, কাকে ডাকবে এখন?

এই সময় হঠাৎ একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন দীর্ঘ সৌম্য প্রায়-বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন, 'এসো, এসো, ভিতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

Banglabook.org

ভয় পেয়ে চমকে উঠল অন্তু আর অমল। অন্তু ফিসফিস করে বলল, 'রাজাবাবু, এ সেই রাজাবাবু! চলে আয়।' তারপর ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। প্রাণপণে পাড়ে উঠে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমল কি করবে ভেবে পেল না। অতবড় একজন লোকের সামনে হাত পা ছুঁড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর লজ্জা করল। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই সৌম্য বৃদ্ধ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলেন অন্তুকে। তারপর অমলের দিকে ফিরে বললেন, 'এসো, ভিতরে এসো।' হাত ধরে অমলকে নিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে।

বৃদ্ধের মুখে সাদা দাড়ি, পা পর্যন্ত ঝোলানো একটা আলখাল্লা পরা, ঘরটা সুন্দর সাজানো। জানলার পাশে একটা ছোট টেবিল। সেখানে পিতলের প্রদীপদান, দোয়াত কলম, একটা কাগজে কয়েক লাইন কি যেন লেখা। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, ঘরের কোণে একটা বেতের চেয়ারের মাথায় সেই সাদা পাখিটা।

—'ঐ তো সেই পাখিটা।' হঠাৎ অমল বলে উঠল।

—'তুমি বুঝি ওটাকে ধরতে চেয়েছিলে?' প্রসন্ন হেসে বৃদ্ধ বললেন।

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু ওকে তো ধরা যায় না। ও এমনিই উড়ে উড়ে বেড়ায়।'

—'কিন্তু আমি যে ওর জন্যে একটা খাঁচা বানালুম।'

—'তা বেশ করেছ। সে খাঁচায় পাখি রাখবার দরকার নেই। খাঁচার মধ্যে পাখিটাকে মনে মনে কল্পনা করে নিও। সে কল্পনার পাখি দেখবে কেমন সুন্দর গান করবে, ডাকবে। আসল পাখিগুলো উড়ে বেড়াক আকাশের বিশাল নীল মাঠে, কেমন?

অমল মাথা নাড়ল। সব কথা সে ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু তার ভাল লাগল।

—'তোমার নাম কি?'

—'অমল।'

—'বাঃ, ভারি সুন্দর নাম।'

—'আপনি কে, আপনি কি রাজাবাবু? আপনার জন্যই কি আজ আমাদের ইস্কুল ছুটি?'

BanglaBook.org

—'না, আমি রাজাবাবু নই, আমি তোমাদেরই লোক।'

—'আপনার নাম কি?'

—'আমার নাম তোমার মত অত সুন্দর নয়। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

বিস্ময়ে অমলের চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম। 'আপনিই তো সেই। আপনার জন্যই তো বাবা দুদিন ধরে জমিদারবাবু আসবেন, জমিদারবাবু আসবেন, বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

—'না অমল, আমি রাজাবাবু নই, আমি তোমাদেরই লোক। আমি তোমার বন্ধু।'

—"আপনি 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে' লিখেছেন? আর সেই 'ভূতের মতন চেহারা যেমন'। সেই 'পঞ্চ নদীর তীরে', 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত'—সব আপনার লেখা?"

—'হ্যাঁ। তোমার ভাল লাগে?'

—'আমি সব পড়েছি। আমার কাছে যা আছে। কিন্তু আর নেই, আর পড়তে পাই না। আর লেখেন নি?'

—'অনেক লিখেছি, অনেক, সে-সব বড় হয়ে পড়বে। আচ্ছা তোমার জন্য আর একটা নতুন লিখব।'

এমন সময় বাইরে একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল। 'কর্তাবাবা আছেন নাকি!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বসো অমল, দেখে আসি কে এসেছে।' তিনি বাইরে এলেন।

বাইরে একজন লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নায়েবের ভাই লোচনদাস ঘোষ। সে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল।

—'কি খবর লোচন?'

—'আজ্ঞে, আমার ছেলেটা নাকি এখানে এসেছে। বড় দুরন্ত ছেলে, হয় তো আপনাকে বিরক্ত করছে।'

—'অমল তোমার ছেলে? ভারী সুশ্রী ছেলেটি।'

বাবার গলা শুনে অমল বেরিয়ে এল বাইরে। এখন আর তার ভয় নেই। এই সময় সাদা পাখিটি ঝটপট করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে কোন দিকে উড়ে গেল। অমল সেইদিকে তাকিয়ে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

BanglaBook.org

—'যাও অমল, বাবার সঙ্গে যাও, আবার এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

—'কিন্তু আমার সেই নতুন বই?'

—'সেই বই লেখা হলে তোমাকে চিঠি লিখব।'

অমল চলে গেল। তারপর থেকে তার দিন কাটতে লাগল অন্যরকমভাবে। যাঁর নামে গ্রামের সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে যায়—তিনি অমলের বন্ধু। তিনি অমলকে চিঠি লিখবেন, বলেছেন। অন্ত যখন খেলায় ফার্স্ট হয়, তখন অন্তকে অমলের একটুও হিংসে হয় না। অন্তর তো তার মত কোন বন্ধু নেই, অন্তর জন্য তো কেউ বই লিখবে বলেনি।

তারপর নানান দেশ বিদেশ ঘুরে অনেক লোকজন দেখে দুবছর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার এলেন শিলাইদহের সেই ছোট্ট গ্রামে। গ্রামের লোকজন সকলে এসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গেল। অমলের কথা তাঁর মনেই পড়ল না। হঠাৎ একদিন সকালবেলা তাঁর সেই বজরা নৌকোর গলুই-এ সেই সাদা পাখিটিকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল সেই ছেলেটির কথা। যে একটা খাঁচা বানিয়েছে পাখিটার জন্য। ব্যস্ত হয়ে তিনি নায়েবকে ডেকে তার ভাইয়ের ছেলের খোঁজ করলেন। শুনলেন যে অমলের খুব অসুখ। দু' মাস ধরে ভুগছে। বাঁচে কি মরে ঠিক নেই। বিচলিত হয়ে তিনি বললেন, 'আমি অমলকে দেখতে যাব।'

গ্রামের পথ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হেঁটে চলেছেন। সঙ্গে বেশি লোকজন আনেননি। এক জায়গায় দেখলেন, একটি সুন্দর ছোট্ট মেয়ে শেফালী ফুল তুলছে। মেয়েটা লাল পাড়ের শাড়ি পরেছে, ফর্সা রঙ—তাকেও একটা শেফালী ফুলের মতই দেখাচ্ছে।

—'তোমার নাম কি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমার নাম সুধা।' মেয়েটি বললো।

—'তুমি অমলকে চেনো?'

—'হ্যাঁ—।' মেয়েটি সুর করে উত্তর দিল তারপর একটু থেমে নিচের দিকে চেয়ে বলল, 'তার যে খুব অসুখ।'

রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আবার চললেন। বাড়ির উত্তরের ঘরে অমল শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে ডাক্তার—কবিরাজ—আত্মীয়, অমলের বৃদ্ধ ঠাকুর্দা। কি

BanglaBook.org

শীর্ণ চেহারা হয়েছে অমলের, চেনাই যায় না প্রায়। তাঁকে দেখেই অমলের চোখ ছল ছল করে উঠলো। ক্ষীণ গলায় বলল, 'আপনি এসেছেন?'

—'হ্যাঁ। অমল; আমি এসেছি। তোমার কোন ভয় নেই।' তারপর রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর মত কথার জাদুকরও কথা হারিয়ে ফেললেন। একটুক্ষণ চেয়ে বললেন, 'আমি খবর এনেছি—তোমার সঙ্গে রাজার দেখা হবে।'

—'রাজা?'

—'হ্যাঁ, অমল। আমি তোমার বন্ধু, তোমার সঙ্গে এক মহান রাজার দেখা হবে—যাঁকে আমরা পর্যন্ত দেখতে পাইনি।'

—'আমার চিঠি? আমাকে চিঠি লিখলেন না?'

—'ঐ দেখ, স্বয়ং রাজা তোমাকে চিঠি লিখেছেন।' রবীন্দ্রনাথ আঙুল তুলে জানলার দিকে দেখালেন। অমল তাকিয়ে দেখল, সকলে দেখল, জানলা দিয়ে বর্শার মত রোদ্দুরের শিখা পড়েছে—আর সেই জানলার শিকে সেই সাদা পাখিটা বসে আছে। কি আশ্চর্য পাখি, ঠিক এসে অমলের জানলায় বসেছে। ঘরের কোণে অমলের তৈরী খাঁচাটা এখনও আছে।

অমল একদৃষ্টে সেই পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর হনহন করে বজরার দিকে ফিরে চললেন। যেন তিনি বিষম ব্যস্ত, তাঁর আর সময় নেই। তাঁকে এখুনি গিয়ে অমলের জন্য একটা বই লিখতে হবে।

BanglaBook.org

রাজপুত্তুরের অসুখ

যখন যা চাই, তক্ষুণি সেটা এসে পড়বে, কোনো কিছুরই অভাব নেই। তবু মলয়কুমারের মুখে হাসি নেই। যখন-তখন সে গিয়ে বিছানা শুয়ে পড়ে। দিন-দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। মহারাজার একমাত্র ছেলে এই রাজকুমার মলয়ের খুব অসুখ।

আজকালকার দিনে তো আর আমাদের দেশে একটাও রাজামহারাজা নেই। তাই মলয়কুমার সত্যিকারের রাজকুমারও নয়। কিন্তু মলয়ের বাবা পাঁচটা খুব বড় কারখানার মালিক। তিনি থাকেন রাজা-মহারাজাদের স্টাইলে। তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিল রাজপুতানা থেকে, কিন্তু এখন সবাই বাঙালী হয়ে গেছে। নিউ আলিপুরে ওঁদের বাড়িটা যে-কোনো রাজবাড়ির চেয়েও বড়। এ-বাড়ির হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া না থাকলেও গ্যারাজে আছে দশখানা মোটরগাড়ি আর বাড়িভর্তি দাসদাসী। শুধু মলয়কুমারের জন্যই তিনজন চাকর, একজন ঝি, একজন গয়লা আর একজন ড্রাইভার।

মলয় ইচ্ছে করলেই যত খুশি চকলেট-লজেন্স খেতে পারে। কিংবা আইসক্রীম। কিংবা চাইনীজ খাবার। কিংবা সন্দেশ-রসগোল্লা। সে মুখের কথাটি খসালেই সব এসে যাবে। কিন্তু মলয় কিছুই খেতে চায় না। তার বয়েস এখন চোদ্দ বছর, রোগা, শুকনো চেহারা। কোনো খাবার তার সামনে আনলেই সে নাক কুঁচকে নাকি গলায় বলে, 'না, কিঁচ্ছু খাঁব না, সঁব কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও।'

কত বড় বড় ডাক্তার আসেন। লম্বা-লম্বা কাগজে কতরকম ওষুধের নাম লিখে দিয়ে যান। কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আবার নতুন ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি এসে আগের ডাক্তারের সব ওষুধের নাম কেটে দিয়ে আবার নতুন ওষুধ লিখে দেন। মলয়কুমার তবু খাবার দেখলেই বলে, 'কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও!'

তার কুকুরটা ইয়া মোটা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন আর মলয়কুমার আরও শুকিয়ে-শুকিয়ে একেবারে খ্যাংরা কাঠি হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার গরুর দুধে ভেজাল থাকে বলে মলয়ের জন্যে আলাদা গরু কেনা হয়েছে। ওদের নিজস্ব গয়লা মলয়ের সামনে সেই দুধ দোয়। কোনো রকমে ভেজাল দেবার উপায় নেই। তবু একদিন মলয় সেই দুধে চুমুক দিয়ে বলল, 'ইঁ, পঁচা গঁন্ধ।'

BanglaBook.org

তারপর থেকে আর সে দুধ খায় না। মলয়ের মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বাড়িতে পোষা গরুর দুধও যদি ছেলে না খায় তা হলে আর এর চেয়ে ভাল দুধ কোথায় পাওয়া যাবে? ছেলে যদি দুধও না খায়, তা হলে বাঁচবে কী করে? মলয়ের মা কান্নাকাটি করে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিলেন বাড়িতে। তিনি বলতে লাগলেন, ছেলে না খেলে তিনিও আর কিছু খাবেন না।

মলয়ের বাবা কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাই থেকে দশজন বড় বড় ডাক্তার আনিয়ে এক মিটিং বসিয়ে দিলেন বাড়িতে। তার একমাত্র ছেলে, একে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে লাভ হল এই যে, ডাক্তারদের মধ্যেই একটা ঝগড়া বেধে গেল। প্রায় প্রত্যেকে বললেন আলাদা-আলাদা রোগের নাম, খেতে বললেন নতুন-নতুন ওষুধ।

খালি দুজন ডাক্তার বললেন, মলয়ের কোনো অসুখই নেই। সব সময় ভাল-ভাল খাবার খেয়ে-খেয়ে ওর হয়েছে অরুচি। সেই দুজনের মধ্যে একজন বললেন, ওকে আর কিছু খাবার দেবার দরকার নেই। দুদিন উপোসে রাখলেই ছেলে গপাগপ করে সব কিছু খাবে। আর একজন ডাক্তার বললেন, অত কিছু করারও দরকার নেই। না খেতে চাইলেই ওকে দুটো করে থাপ্পড় মারতে হবে। দশ-বারোটা থাপ্পড় খেলেই ওর সব রোগ সেরে যাবে।

মলয়ের বাবা সেই দুজন ডাক্তারের দিকে কটমট করে তাকালেন। আর তাঁদের বিদায় করে দিলেন তক্ষুণি। বাকি আটজন ডাক্তারের আট রকম ওষুধেও কোনো উপকার হল না। মলয় সেইসব ওষুধও কুকুরকে খাইয়ে দিতে বলল।

তারপর হোমিওপ্যাথি, কবিরাজ, সাধুবাবার ওষুধ, ফকিরের তাবিজ অনেক কিছু দিয়েই চেষ্টা করা হল। কিছুতেই কিছু হল না। মলয় এখন শয্যাশায়ী। আর বেশি দিন বোধহয় সে বাঁচবে না।

তখন বাড়ির একজন চাকর মলয়ের মাকে বলল, 'মা, বৌবাজারে এক জ্যোতিষী আছেন, তাঁকে এনে দেখাবেন? তিনি আবার কবিরাজি চিকিৎসাও করেন। ওনার চিকিৎসায় মরা মানুষও উঠে বসে।'

মলয়ের মা বললেন, 'ডাক্, ডাক্ শিগগির সেই জ্যোতিষীকে ডাক্।'

সন্ধ্যেবেলা সেই জ্যোতিষী এসে হাজির। তার নাম মাধব পণ্ডিত। তার চেহারা দেখলে কিন্তু ভক্তি হয় না একটুও। পাগলা-পাগলা চেহারা, খালি পা, গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা চাদর জড়ানো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল

BanglaBook.org

আর চোখ দুটো গাঁজাখোরদের মতন লাল। সে এল ও-বাড়ির চাকর গয়ারামের কাঁধে হাত দিয়ে।

বাড়িতে ঢুকেই সে বলল, 'বাপরে বাপ, কত কত বাড়ি। দেখলেই ভয় করে। নিশ্চয়ই এ বাড়িতে অনেক কুকুর আছে।'

এ বাড়িতে সব মিলিয়ে পাঁচটা কুকুর আছে সত্যি। বাঘের মতন চেহারা।

মাধব পণ্ডিত বলল, 'আগে সব কুকুর বাঁধো।'

মলয়ের বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ আবার কী চিকিৎসা করবে!'

মলয়ের মা বললেন, 'দেখাই যাক না ও কী বলে। কুকুরগুলোকে বাঁধতে বলো।'

মাধব পণ্ডিত মলয়ের ঘরে ঢুকেই বলল, 'টক টক গন্ধ।'

মলয় চোখ বুজে শুয়ে ছিল, চোখ খুলল না।

মাধব পণ্ডিত বলল, 'সব পচা খাবার!'

মলয় এবার চেয়ে দেখল মাধব পণ্ডিতকে।

মাধব পণ্ডিত বলল, 'এ সব পচা খাবার কি রাজপুত্তুর খেতে পারে? ওর দোষ কী।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'পচা খাবার মানে? কলকাতার সবচেয়ে বড় দোকানের সবচেয়ে ভাল খাবার দেওয়া হয় ওকে।'

মাধব পণ্ডিত বলল, 'হোটেলের খাবার, দোকানের খাবার তো। ওসব আমি জানি। ছেলেকে খাঁটি টাটকা খাবার দিন। ছেলে ঠিক খাবে!'

মলয়ের মা বললেন, 'বাড়ির পোষা গরুর দুধ, সেটাও টাটকা নয়। এর থেকে টাটকা দুধ আর হয়?'

মাধব পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার গরু?'

'মুলতানের গরু।'

'তাই বলুন ! যাদের বয়স ষোল বছরের কম, তাদের কক্ষনো মুলতানী গাইয়ের দুধ সহ্য হয় না। ভাগলপুরী গরুর দুধ সবচেয়ে ভাল।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, কালই ভাগলপুর থেকে গরু কিনে আনাচ্ছি।'

মাধব পণ্ডিত বলল, 'দাঁড়ান, অত সহজ নয়। ভাগলপুরের গরু কলকাতায় এসে খাবে কী? সেই তো শুকনো খড়। তাতে আবার পচা দুধ দেবে।

BanglaBook.org

ভাগলপুরের ঘাস খাওয়াতে হবে। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা শিশির পড়ে থাকে যে ঘাসে, সেই ঘাস খাওয়াতে হবে গরুকে। তাহলে সেই গরু টাটকা দুধ দেবে।'

'ভাগলপুরের ঘাস এখানে কী করে পাব?'

'এখানে পাবেন না। ভাগলপুরে পাবেন।'

'ঠিক আছে। ভাগলপুরে একটা বাড়ি কিনছি, মলয় গিয়ে কিছুদিন ওখানে থাকুক!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। সেই দুধ খেয়ে হজম করতে হবে তো। আপনার ছেলের হয়েছে বদহজমের অসুখ, এখন ভাগলপুরের জল তো ওর সহ্য হবে না! ওর জন্য এখন লাগবে দেওঘরের দুধকুণ্ডের জল।'

'তা হলে দেওঘরে একটা বাড়ি কিনি, সেখানে গিয়ে থাকুক কিছুদিন।'

'দেওঘরে থেকে ভাগলপুরের গরুর দুধ খাবে কী করে?'

'রোজ আনিয়ে নেব ওখান থেকে। তা হলে ছেলে ঠিক সারবে তো?'

'ছেলে কি শুধু জল আর দুধ খেয়ে বাঁচবে? ভাত খেতে হবে না? শাক তরকারি, মাছ মাংস খেতে হবে না? ও ছেলের কপালে কী লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন?'

'কপালে আবার কী লেখা আছে। থাকলেও তা দেখা যায় নাকি?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি। ওর কপালে লেখা আছে লালগোলা।'

'লালগোলা।'

'হ্যাঁ, লালগোলা! লালগোলা একটা জায়গার নাম।'

'তা তো জানি। কিন্তু একটা জায়গার নাম ওর কপালে লেখা থাকবে কেন!'

'আগের জন্মে ও জন্মেছিল লালগোলায়। ওর ষোল বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত ওকে লালগোলার রূপশালি ধানের ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত খাওয়াতে হবে।'

'ঠিক আছে, সেই চালই আনাব।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। বলেছি না, টাটকা জিনিস চাই। প্রত্যেকদিন এককৌটো ধান ঢেঁকিতে ছাঁটিয়ে সেই চালের ভাত খাওয়াতে হবে। আগের দিনের চালের ভাত খাওয়ালে কোনো লাভ নেই।'

BanglaBook.org

'বাবাঃ! তা হলে তো লালগোলায় গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে একটা বাড়ি কিনব?'

'কিন্তু লালগোলায় গিয়ে থাকলে দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের টাটকা দুধ খাবে কী করে?'

'তাও তো বটে!'

'আরও আছে! হজমের অসুখের পক্ষে খুব ভাল হচ্ছে পেঁপে সেদ্ধ। ঐ পেঁপে সেদ্ধ খাইয়ে আমি কত রুগীকে ভাল করেছি। কোথাকার পেঁপে বিখ্যাত জানেন? পুরুলিয়া। পুরুলিয়া থেকে প্রত্যেকদিন একটা করে গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা টাটকা পেঁপে যদি খাওয়াতে পারেন...'

মলয়ের বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'অসম্ভব। যত সব বুজরুকি। পুরুলিয়ার পেঁপে, লালগোলার চাল, দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ—প্রত্যেকদিন এগুলো এনে খাওয়ানো যায়! এত বাড়ির ছেলেরা সাধারণ খাওয়া খেয়ে ঠিকঠাক থাকছে...

মাধব পণ্ডিত বলল, 'এত বাড়ির ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের তুলনা! ও তো সাধারণ ছেলে নয়। চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি ক্ষণজন্মা। কবে যে মায়া কাটিয়ে চলে যাবে—'

মলয়ের মা প্রায় কেঁদে উঠে বললেন, 'আঁ। ছেড়ে চলে যাবে! ওগো, তুমি যেমন করে পারো, ওগুলো জোগাড় করো।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'এ কি সম্ভব নাকি? চারটে জায়গা চার দিকে। কী করে রোজ এসব জোগাড় হবে।'

তখন মলয় হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি পুরুলিয়ার পেঁপে খাব।'

সবাই চমকে উঠল সেই কথা শুনে। অনেকদিন বাদে মলয় এই প্রথম একটা কিছু খেতে চাইল নিজের মুখে।

মলয়ের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমাকে পুরুলিয়ার পেঁপে এনে দেব। আজই এনে দেব।'

মলয় বলল, 'আমি লালগোলার চাল খাব।'

মলয়ের মা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই এনে দেব।'

মলয় আবার বলল, 'আমি দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ খাব। সব এক সঙ্গে!'

BanglaBook.org

এই বলে মলয় মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে ভেবেছে, এইবার তার বাবা জব্দ হবেন! সে যখন যা চেয়েছে, সবই এনে দিয়েছেন তার বাবা। কিন্তু এবার আর তিনি তা পারবেন না।

কিন্তু মলয়ের বাবা মাধব পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এই সবই আমি যোগাড় করব। কিন্তু পণ্ডিত, এতেও যদি ছেলের অসুখ না সারে?'

মাধব পণ্ডিত বলল, 'এরপরও যদি আপনার ছেলের রোগ না সেরে যায়, তাহলে আমার নাক-কান কেটে আমায় ডালুকত্তা দিয়ে খাওয়াবেন। কিন্তু একদিন খাওয়ালে হবে না। রোজ খাওয়াতে হবে এরকম, ছ'মাস ধরে অন্তত একটানা।'

মলয়ের বাবা বললেন, 'তাই হবে। এতেও যদি ছেলে না সারে, তাহলে তোমার গর্দান নেবো আমি। রেলের চাকার নিচে তোমার কাটামুণ্ডু গড়াবে। আর যদি ভাল হয়ে যায়—তাহলে তোমায় কত দিতে হবে?'

মাধব পণ্ডিত চোখ বুজে জিভ কেটে বলল, 'আমায় কিছু দিতে হবে না! আমি পয়সা-কড়ি ছুঁই না। লোকের চিকিৎসা করে যদি আমি টাকা নিতাম, তাহলে কি আর আমাকে খালি পায়ে হাঁটতে হয়? আমি শুধু পরের উপকার করি।'

যেন একটা খুব মজার কথা বলেছে, এই ভাবে মাধব পণ্ডিত নিজেই হেসে উঠল হো হো করে।

মলয়ের বাবা সেইদিনই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। চারজন চাকরকে পাঠালেন চারদিকে। এখন ট্রেনে বাসে সব জায়গায় যাওয়ার অনেক সুবিধে আছে। চারজন চাকর চলে যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর পুরুলিয়া। সেখান থেকে তারা ভোরবেলা চাল, জল, দুধ আর পেঁপে নিয়ে ফিরে আসবে বিকেলের মধ্যে। জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে তারা আবার চলে যাবে তক্ষুণি। আবার পরের দিন আসবে। এই ভাবে চলবে। চারজন লোক নিয়ে এল চাল আর জল আর দুধ আর পেঁপে। সেগুলো নামিয়ে রেখে তারা আবার ছুটল স্টেশনে। সেই দুধ খাওয়ার পর মলয়ের মা বললেন, 'এবার খাবি তো?' মলয়ের বাবা কোমরে হাত দিয়ে রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন। মলয় দুধের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'আ, এই দুধটা পচা নয়।' তারপর দেওঘরের জলে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'আ, এই জলটা খাঁটি।'

BanglaBook.org

এরপর সে লালগোলার চালের ভাত আর পুরুলিয়ার পেঁপেসেদ্ধ খেল বেশ আরাম করে অনেকদিন পর।

দিনের পর দিন এই রকম চলতে লাগল। স্বাস্থ্য ফিরে গেল মলয়ের। এক সপ্তাহের মধ্যে সে শুরু করে দিল দৌড়ঝাঁপ। ওদের বাড়িতে সকলের মুখে হাসি ফুটল। শুধু মলয়ের পোষা কুকুরটা আর মলয়ের ফেলে দেওয়া ভাল-ভাল খাবার খেতে পায় না বলে মাঝে মাঝে কুঁইকুঁই করে!

এরপর এই গল্পের শুধু আর-একটু বাকি আছে। সেটা অবশ্য মলয়দের বাড়ির কেউ জানে না। লেখকরা ডিটেকটিভদের মতন সব কিছু জেনে ফেলে কিনা, তাই ওটুকু আমিও জেনে ফেলেছি।

মলয়দের বাড়ি থেকে চারজন চাকর বেরিয়ে যায় স্টেশনের দিকে। তারা যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর পুরুলিয়া। স্টেশনের কাছাকাছি এসেই তারা সুট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পালিয়ে যায়। চারজনেই চলে আসে বৌবাজারে মাধব পণ্ডিতের আস্তানায়। সেখানে তারা খুব করে গাঁজা আর জিলিপি খায় আর ঘুমোয়। পরদিন একজন রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল ভরে নেয় কুঁজোয়। একজন ছানাপট্টির গয়লাদের কাছ থেকে কিনে নেয় এক কিলো দুধ, একজন বাজার থেকে কিনে নেয় সবচেয়ে শস্তা চাল, আর একজন কেনে একটা পেঁপে। তারপর সেইগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ত ভাব করে চলে যায় বাড়ি। সেগুলো রেখেই তারা আবার দৌড়ায়। আবার এসে হাজির হয়ে যায় মাধব পণ্ডিতের আড্ডায়। ট্রেন ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সায় খেয়ে তারা নিজেরা খুব আনন্দ করে।

কলকাতার আর সব ছেলেরা যে চাল আর দুধ আর জল আর পেঁপে খায়, সেগুলো খেয়েই কিন্তু এখন মলয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়ে গেছে। এখন সে ইস্কুলের টিমে দারুণ ক্রিকেট খেলে। আর বাড়ি ফিরেই বলে, 'শিগগির খাবার দাও, দারুণ খিদে পেয়েছে!'

BanglaBook.org

নিউইয়র্কের সাদা ভাল্লুক

অতবড় জন্তুটাকে দেখে হঠাৎ সব গাড়ি থেমে গেল।

নদীর অনেক নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নিউইয়র্ক শহরে ঢুকতে হয়। সুড়ঙ্গের মধ্যে ধপধপে শ্বেত পাথরে বাঁধানো চওড়া রাস্তা, নিওন আলো জ্বলছে, কে বলবে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বিশাল চওড়া আর গভীর নদী। মটর গাড়িগুলো ঘোরানো রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেমে যায় সুড়ঙ্গে, তারপর নদীর নিচের রাস্তা দিয়ে একবারও না থেমে পৌঁছে যায় নিউইয়র্ক শহরে, ও রাস্তায় গাড়ি থামানো নিষেধ।

কিন্তু ঐ বিশাল জন্তুটাকে দেখে সব গাড়ি থেমে গেল সারি দিয়ে। কতরকম হর্ন আর ভেঁপুর আওয়াজ হতে লাগলো। পিছনের গাড়ির লোক তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তারপরে সবাই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো, দুরে সেই বিরাট সাদা জন্তুটা প্রায় সারা সুড়ঙ্গ জুড়ে আছে, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন দেখছে। বোধহয় চকচকে দেওয়ালে নিজের মুখ দেখতে চায়।

অতদূর থেকে ওটা যে কি জন্তু তা ভালো করে চেনা যায় না। কিন্তু নদীর নিচের রাস্তা বলেই প্রথমে মনে হল কোনো জলজন্তু, কাছেই সমুদ্র, বুঝি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জীব। তাহলে কি সুড়ঙ্গ ভেঙে ঢুকেছে? সর্বনাশ, তা হলে তো জল ঢুকে এখুনি সবাই মরে যাবে। কিন্তু, এখনো তো কোথাও এক ফোঁটা জল দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে নানান গাড়ির মধ্যে ছোটো ছেলে মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করছে। দু'একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল পর্যন্ত। অত লোকের চেঁচামেচি, অথচ জন্তুটার কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ কেউ চেষ্টা করলেন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পিছন দিয়ে পালিয়ে যেতে। তখন আবার আরেক রকম গোলমাল, গাড়ির শব্দ, হর্ন, 'এই এই সাবধান, বাঁ দিক বাঁচিয়ে, দাঁড়ান্ আগে আমি পার হয়ে যাই!'— এই সব। তখন আবার হঠাৎ দেখা গেল, জন্তুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়। জন্তুটার গায়ের রঙ সাদা, একেই সাদা পাথরের দেয়ালের পাশে ওকে খানিকটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল, এখন যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত গাড়ির ভিড়ের মধ্যে জন্তুটা এদিকেই তেড়ে এসেছে ভেবে— একদল লোক ভয়ের চোটে 'হেল্প্' 'হেল্প্' বলে কান্নাকাটি শুরু করে

BanglaBook.org

দিল। আমি একটা গ্রে হাউন্ড বাসে বসেছিলাম, কাচের জানলা দিয়ে দেখলাম জন্তুটা লাফাতে লাফাতে সামনের দিকেই যেন চলে গেল।

পরের দিন সকালে আমেরিকার সব কাগজে হেড লাইন ঃ

নিউইয়র্ক শহরে অদ্ভুত প্রাণী !!

সব কাগজেই আপশোস করে লিখেছে, ইস্, এতগুলো মানুষ ছিল ওখানে, কেউ একটা ছবি তুলে রাখতে পারলো না! ক্যামেরা তো প্রায় সব আমেরিকানেরই মটর গাড়িতে থাকে যখন তখন, জন্তুটার একটা ছবি তুলে আনার কথা কারুর মনে এলো না? সেই সঙ্গে বেরুলো অনেক গাঁজাখুরি গল্প, আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! কেউ বলছে, জন্তুটাকে দেখতে একটা বেড়ালের মত, তবে প্রায় দোতলার সমান উঁচু। কেউ বলছে, না না, ওটা একটা গরিলা। একজন বলেছে, একটা নয়, ওখানে ছিল অন্তত তিনটে—হাতি আর জিরাফে মেশানো এক ধরনের বীভৎস প্রাণী। আবার কেউ বলেছে, ওটা গরিলা নয়। আসলে কম্যুনিস্টদের গেরিলা বাহিনী ছদ্মবেশে এসেছে।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় খবরের কাগজ নিউইয়র্ক টাইমস্ ছাপা হয় ১২০ পাতা, তার অর্ধেক জুড়েই এই সব কথা। সেই সঙ্গে টেলিভিশন আর রেডিওতেও কান ঝালাপালা, আসল সত্যি কথা কেউ বললে না। আমি যেটা দেখেছিলুম ওটা একটা সাদা ভাল্লুক। কি করে ওখানে এলো তা কে জানে।

তিনদিন পর আবার ওর খোঁজ পাওয়া গেল। এবার ছবি সমেত। নিউইয়র্ক শহরের বাইরেই দোতলা-তিনতলা রাস্তা আছে। তার মানে একটা রাস্তা, তার মাথার ওপর দিয়ে একটা রাস্তা, তার মাথায় আর একটা রাস্তা। সেই রকম একটা তিনতলার রাস্তার রেলিং ধরে দোতলায় দোল খাচ্ছে ভাল্লুকটা। ধপ্‌ধপে সাদা রঙ, বিশাল চেহারা, মুখখানা হাসি হাসি। ভাল্লুকটা কাউকে তাড়া করেনি, কাউকে মারেনি, কিন্তু ভয়ে মটরগাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে ওখানেই দশজন লোক মারা গেছে। সেই সময় ভাল্লুকটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এরপর তো শহরে আর কোনো কথা নেই। কি করে এলো ভাল্লুকটা? কেউ বললো, উত্তরমেরু থেকে এসেছে কানাডা পার হয়ে। কেউ বললো, কোনো চিড়িয়াখানা থেকে ভেঙে বেরিয়েছে! কিন্তু কোনো চিড়িয়াখানায় তো অতবড় ভাল্লুক নেই, তাও সাদা ভাল্লুক নেই। অনেকে আবার ভাল্লুক চোখেও দেখেনি—আমাকে দু'একজন জিজ্ঞেস করলো ভাল্লুকের লেজ আছে

BanglaBook.org

কিনা, ভাল্লুক কি খায়—এইসব। যেন, আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি বলে সব বিষয়েই জানি। আসলে তো কিছুই জানি না, ভাল্লুক বিষয়ে তো একেবারেই কিছু জানি না, তবে এইটুকু শুধু জানি যে ভাল্লুক মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলে মানুষের মত কথা বলতে পারে। ওর তো প্রমাণ আছেই। বাঃ, সেই যে দুই বন্ধুর কথা পড়েছি। বনের মধ্যে দিয়ে দুই বন্ধু যাচ্ছিল—হঠাৎ একটা ভাল্লুক এসে পড়ায় এক বন্ধু তাড়াতাড়ি গাছে উঠে প্রাণ বাঁচালো। আর এক বন্ধু, যে গাছে চড়তে জানে না, সে মড়ার মতো শুয়ে রইলো মাটিতে। তখন ভাল্লুক এসে তার কানে কানে বললো, যে বন্ধু বিপদের সময় তোমাকে ফেলে একা গাছে উঠে যায়, তাকে আর কখনও বিশ্বাস করো না।

যাই হোক, নিউইয়র্ক শহরে যদিও গাছপালা নেই, আমি বেশ ভয়ে ভয়ে ঘুরতে লাগলাম। সন্ধে হতে না হতেই ফিরে যাই বাড়িতে। অনেক লোক তো ভয়ে আর বাড়ি থেকেই বেরোয় না! সব সময় মুখে শুধু ভাল্লুকের কথা। এ-রকম কাণ্ড এ-শহরে কখনও হয়নি। অনেকদিন আগে একটা সিনেমায় উঠেছিল যে কিংকং নামে একটা বিরাট গরিলা এসেছিল নিউইয়র্কে, তার গায়ে এত জোর যে টান মেরে মেরে চলন্ত রেলগাড়ি থামিয়ে তুলে আছাড় মারতে পারত। এরোপ্লেন ধরে ভেঙে ফেলে মট্ করে। শেষ পর্যন্ত, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মাথায় উঠে বসেছিল। কিন্তু, সে তো গল্প! আর এ যে একেবারে জলজ্যান্ত, সত্যিকারের একটা ভাল্লুক।

মজা হল পরের দিন। সকাল দশটার সময় ১৯/২০ বছরের একটি সুন্দরী মেমসাহেব অফিসে যাচ্ছেন, তাঁর গাউনে একটা বিরাট সাদা ভাল্লুক আঁকা। ওমনি তাঁকে দেখবার জন্য রাস্তায় প্রচুর ভিড় জমে গেল। মেমসাহেবের মুখে গর্বের হাসি। পরদিনই হাজার হাজার মেয়ে ঐ রকম ভাল্লুক আঁকা গাউন পরে রাস্তায় বেরুলো। ঐটাই হয়ে গেল ফ্যাশান। ছেলেরা পরলো ভাল্লুক আঁকা টুপি। ভাল্লুক আঁকা পতাকা বিক্রি হতে লাগলো খুব। 'টেডি বিয়ার' অর্থাৎ কাপড়ের তৈরি ভাল্লুক আমেরিকার বাচ্চাদের প্রিয় খেলনা। হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে নিজের টেডি বিয়ারটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে মার কাছে বলে উঠলো, চাই না খেলনা ভাল্লুক, আমি সত্যিকারের চাই! অমনি চার পাশের বাড়ি থেকে সব বাচ্চারা নিজেদের খেলনা ভাল্লুকগুলো ধপাধপ্ রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বললো, চাই না খেলনা ভাল্লুক, আসল ভাল্লুক চাই।

ভাল্লুকটা দিন চারেক অদৃশ্য হয়েছিল। আবার তাকে দেখা গেল শহরের একেবারে মাঝখানে, সেন্ট্রাল পার্কে। সেন্ট্রাল পার্ক আমাদের কলকাতার

BanglaBook.org

ময়দানের মতো। বিরাট বড়। সেখানে এক জায়গায় বরফের ওপরে রঙিন পোশাক পরা ছেলেমেয়েরা স্কেটিং করে। হঠাৎ দেখা গেল সেই বরফের মধ্যে সাদা ভাল্লুকটা লুটোপুটি খাচ্ছে। হয়তো শহরে খুব গরম লেগেছিল, তাই খুঁজে খুঁজে বরফের জায়গায় এসে তার এত আনন্দ। আর, সঙ্গে সঙ্গে তো সেই ভয়ের হট্টগোল। মেয়েদের চিৎকারে মনে হতে লাগলো যেন শত শত কাচের গেলাস ভাঙছে। কয়েকজন অসম সাহসী ছেলে দল বেঁধে এগিয়ে এলো ভাল্লুকটার দিকে—কিন্তু ভাল্লুকটা মেঘের ডাকের মতো একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে এক মুঠো বরফ ছুঁড়ে মারতেই ওরা মূর্ছা গেল। তারপর ওটা নিশ্চিন্তে হেলে দুলে পার্কের পেছন দিকের গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলে গেল কোথায়!

এবার গভর্নমেন্টের টনক নড়লো। সত্যিই এরকম একটা বিপজ্জনক জন্তুকে শহরের মধ্যে এরকম ঘুরতে দেওয়া তো নিরাপদ নয়। কখন কার ক্ষতি করে। একে ধরতেই হবে। সারাক্ষণ সাইরেন বাজিয়ে ঘুরতে লাগলো পুলিশের গাড়ি। আকাশে উড়তে লাগলো এরোপ্লেন ভাল্লুকের খোঁজে। টেলিভিশন কোম্পানির লোক দলে দলে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে লাগলো—যদি এমন একটা অভূতপূর্ব ব্যাপারের ছবি তুলতে পারে। শহরের মেয়র ঘোষণা করে দিলেন, যে-কেউ ভাল্লুকটাকে গুলি করে মারতে পারবে, সে দশ হাজার ডলার পুরস্কার পাবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, কেন ভাল্লুকটাকে মারা হবে ? ওকে জীবন্ত ধরা উচিত, মেরে ফেলা অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। ও তো সত্যিই কারুর ক্ষতি করেনি এখনো, তা ছাড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাণী আছে, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে যে কোনো দেশের অধিবাসীরই স্থান আছে আমেরিকায়। ভাল্লুক কি একটা জাত নয়? এবং ও কোনো না কোনো দেশের অধিবাসীও নিশ্চয়ই, ওকে মারা তো উচিতই নয়, বরং কেউ যদি হঠাৎ মারে তবে তাকে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে—একথা ঘোষণা করা উচিত, বিশেষত নিগ্রোরা তো নিশ্চয়ই ওকে পেলেই মেরে ফেলবে। সাদা ভাল্লুক কিনা। যে কোনো সাদা জিনিসের ওপরেই তো ওদের রাগ। যে জন্যে দুধের বদলে ওরা কালো জামের রস খায়। ভাল্লুকটাকে যদি শেষ পর্যন্ত মারতেই হয়, আমরা মারবো, নিগ্রোরা যেন না মারে!

এ কথায় নিগ্রোরা তো রেগে আগুন। তারা বললো, সাদা লোকেরা এমন পাজি, সব সাদা জিনিসই ওরা নিজেদের দিকে টানতে চায়। তা ছাড়া ওটা সাদা ভাল্লুক না হাতি! ভাল্লুক আবার সাদা হয় নাকি। চিরকাল তো কালোই হয়ে এসেছে। আসলে ওটা ওদের কারসাজি, কিংবা বোধহয় কালো ভাল্লুকের গায়ে সাদা চুনকাম করেছে।

BanglaBook.org

যাই হোক, ভাল্লুক দেখে ভয় পায় সাদা লোকেরাই। আমরা ভয় পাই না। যদি হার্লেম পাড়ায় (নিউইয়র্কের নিগ্রো পাড়া) ভাল্লুকটা আসে—আগে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো—ওটা কালো না সাদা, যদি সত্যিই সাদা হয়, প্রাণে না মারি, ওটার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।

এর পর ভাল্লুকটা সম্বন্ধে অনেক খবর আসতে লাগলো, কিন্তু কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে বলা মুশকিল। একজন বুড়ো মিস্তিরী বললো, সে ওটাকে দেখেছে রাত দেড়টার সময় শহরের উত্তর এলাকায়, আবার আর একজন দোকানদার বললো, সে সেইদিনই রাত দেড়টায় ওটাকে দেখেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। দুটো জায়গার মধ্যে অন্তত পনেরো মাইলের তফাত—সুতরাং একই সময় দেখা যাবে কি করে! আবার এক ভদ্রমহিলা রাত্রিবেলা এক বাক্স কেক নিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ কে ওটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেয়। ভদ্রমহিলার ধারণা ওটা ভাল্লুকটারই কাজ।

ভাল্লুকটার দেখা পাওয়া যাক না যাক, ওটাকে কেন্দ্র করে সাদা লোক আর নিগ্রোদের মধ্যে নতুন করে ঝগড়া বেধে গেল। নিউইয়র্কের মাটির তলা দিয়ে যে ট্রেন যায় তার নাম সাবওয়ে। সেখানে রেলগাড়ির কামরায় নিগ্রো আর সাদা সাহেবের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল ভাল্লুকটাকে নিয়ে। সাদা সাহেব বললেন, ভাই, সাদা ভাল্লুকটাকে মেরে লাভ কি? তা ছাড়া, কালো-সাদা এসব তফাত করা এখন উচিত নয়। আমেরিকাতে আমরা সবাই সমান হয়ে গেছি। পুরনো কথা ভুলে এসো আমরা বন্ধু হয়ে যাই।

—চোপরাও! নিগ্রোটি বললেন। এখন মুখে খুব সাধু পুরুষের মতো কথা বলা হচ্ছে! তফাত যদি না-ই থাকবে, তবে তোমরা কথা বলার সময় 'সাদা-ভাল্লুক' বলছো কেন? শুধু ভাল্লুক বলতে পারো না? আমরা কি আমাদের ভাল্লুককে 'কালো-ভাল্লুক' বলি, না শুধু ভাল্লুক বলি? সাদা জাতটাই এমনি খারাপ!

—মুখ সামলে কথা বলো, জাত তুলে কথা বলো না বলছি!

বেশ করবো!

—খবরদার!

তারপর আরম্ভ হয়ে গেল মারামারি। এরকম মারামারি ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। নিগ্রো আর সাদা লোকে দেখা হলেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। ভাল্লুকটার এদিকে আর পাত্তা নেই। তবে, ভাল্লুকটাকে পেলে সাদা লোকেরাই নিগ্রোদের আগে—এবং নিগ্রোরা পেলে সাদা লোকদের আগে ওটাকে খুন করবে। তা প্রকাশ্যেই বলতে লাগলো।

BanglaBook.org

আমি পড়লুম মহা মুশকিলে। আগে ছিল ভাল্লুকের ভয়। এখন মারামারির ভয়। যেখানেই দাঙ্গা শুরু হোক—আমার মার খাবার সম্ভাবনা। আমার গায়ের রঙ সাহেবদের মতো ফর্সাও নয়, নিগ্রোদের মতো কালোও নয়। আমাকে হয়তো দু দলই মারবে। আমার সাদা আমেরিকান বন্ধুরা বলতে লাগলো, তোমার ভয় কি! তুমি ত আর কালো নও। আবার নিগ্রো বন্ধুরা বললো, তুমি ত আর সাদা লোক নও! এ দুটোর কোনোটা শুনেই আমার নিশ্চিন্ত হবার কথা নয়।

তারপর ভাল্লুকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। একদিন আমি সিনেমা দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। এখানে সিনেমা দুপুর দেড়টায় আরম্ভ হয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত চলে, একবারও থামে না। একটা লোক একবার টিকিট কিনে ঢুকে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকতে পারে। ঘুম ভাঙলো আমার একেবারে রাত দেড়টায়। সর্বনাশ! কি করে বাড়ি ফিরবো। যদিও সারারাত মাটির তলায় ট্রেন আর বাস চলে—কিন্তু রাস্তা যে প্রায় ফাঁকা, আর আমার বাড়ি যে গলির মধ্যে। উপায় নেই, বেরিয়ে পড়তেই হল। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলাম দূরে একটা চলন্ত সাদা পাহাড়! সেই ভাল্লুকটা। আমার আর তখন পালাবার উপায় নেই। শুনেছি, পালাতে দেখলেই বেশি তাড়া করে। হঠাৎ মনে পড়লো, মরা মানুষকে ভাল্লুক ছোঁয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমি মড়ার ভান করে রাস্তার ওপর দড়াম করে শুয়ে পড়লাম।

ভাল্লুকটা আমার কাছে এসে চার পাশটা একটু ঘুরে দেখলো। আমি তখন নিশ্বাস বন্ধ করে আছি, ও এসে আমায় ভালো করে শুঁকে দেখলো, তারপর জিভ দিয়ে আমার গালটা চাটতে লাগলো। কি খস্‌খসে ধারালো জিভ, ভয়ে আমার প্রাণ প্রায় উড়ে যায় আর কি!

এরপর সেই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটলো। ভাল্লুক সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, অর্থাৎ ইচ্ছে মতন ওরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে, তার স্বকর্ণে প্রমাণ পেলাম। ভাল্লুকটা বললো, ঘর্ র্ র্, হুঁ, রঙ করা নয়, খাঁটি চামড়ার রঙই এরকম দেখছি! তুমি কোথাকার লোক হে ?

আমি চুপ।

—বলো না, এমন ফর্সাও-না কালোও-না চামড়া কোন্ দেশে হয়?

আমি চুপ।

—শিগ্‌গির বলো। তুমি যে মরোনি আমি জানি, বেশি ইয়ে করলে কামড়ে দেবো। তোমার দেশ কোথায়?

BanglaBook.org

—ভারতবর্ষ। আমি মিন্‌মিন্‌ করে জানালুম ।

—ভারতবর্ষ! সে দেশে সব লোকের এমন চমৎকার গায়ের রঙ হয়? শুধু ফর্সা আর শুধু কালো লোক দেখে দেখে চোখ পচে গেল। তোমাদের দেশের সবারই গায়ের রঙ এরকম ?

—হুঁ।

—আমি তা হলে এদেশে আর থাকবো না। ভারতবর্ষেই চলে যাবো। ঘর্‌ র্‌ র্‌ র্‌, হুঁ, চলেই যাবো। তোমাদের দেশেই আমার ভালো লাগবে, ওখানে মধু খাবার জন্য মৌচাক আছে তো?

—হ্যাঁ, অনেক।

—বাঃ, আমি ভারতবর্ষেই যাবো তা হলে। এ মারামারির দেশে থাকবো না। তুমি কবে নিজের দেশে ফিরবে? ওখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে!

পরদিন সকালবেলা একেবারে বড় রাস্তায় মরা অবস্থায় ভাল্লুকটাকে পাওয়া গেল। গায়ে সাতটা গুলির দাগ। সারা গায়ে রক্ত মেখে ভাল্লুকটা করুণ মুখে মরে পড়ে আছে। নিগ্রো কিংবা সাদা লোক কে ওটাকে মেরেছে, তা আর জানা গেল না।

BanglaBook.org

ছোটমাসির মেয়েরা

কলকাতা শহরে বাঘ, ভাল্লুক কিংবা গণ্ডার নেই বটে, তবে কিনা চোর ডাকাত আর ছেলেধরা সবসময় গিসগিস করছে। আমার ছোটমাসির কাছে তাই এই শহরটাও গভীর জঙ্গলের মতন। সব সময় সাবধানে থাকতে হবে।

ছোটমাসির দুই মেয়ে—রুমু আর ঝুমু। ওদের আরও দুটো বেশ ভাল নাম আছে বটে, কিন্তু সে-দুটো বেশ শক্ত, রুমু ঝুমু নামেই সবাই চেনে। ছোটমাসি তাদের এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করেন নি। নেহাত ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া। তাও ছোটমাসি ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দেন, দুপুরে টিফিনের সময় যান, আবার বিকেলে যান নিয়ে আসতে। রুমু আর ঝুমু পড়ে ক্লাস এইট আর নাইনে। ওরা বেশ বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপায়ই নেই, ছোটমাসি সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে চান যে!

আমি একদিন বলেছিলাম, 'এই তো বাড়ির কাছেই স্কুল, ওরা তো হেঁটেই চলে আসতে পারে, কত ছেলেমেয়ে আসে।'

ছোটমাসি চোখ গোল-গোল করে বললেন, 'আর যদি ছেলেধরা ওদের ধরে নিয়ে যায়? ও পাশের পার্কটায় কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার লোক বসে থাকে, দেখলেই আমার কী রকম যেন সন্দেহ হয়!'

আমি বললাম, 'ছেলেধরা ওদের ধরবে কেন? ওরা তো ছেলে নয়।'

ছোটমাসি তখন এক ধমক দিলেন, 'তুই চুপ কর। কিছু বুঝিস না।'

টিফিনের সময় গিয়ে ছোটমাসি কড়া নজর রাখেন ওরা যাতে কোনরকমে ফুচকা বা ঝালমুড়ি না খেয়ে ফেলে। রুমু-ঝুমুর ক্লাসের বন্ধুরা মনের সুখে আলুকাবলি আর ঘুগনি-চটপটি খায়, কিন্তু ওদের সেদিকে যাবারই উপায় নেই। ছোটমাসির চোখের সামনে বসে ওদের বাড়িতে-তৈরী খাবার খেতে হয়।

আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের ডালমুট, চানাচুর আর হজমি গুলি খাওয়াই। যদিও জানি, ধরা পড়ে গেলে ছোটমাসির হাতে আমাকেও বোধহয় মার খেতে হবে!

BanglaBook.org

ছোটমাসির ধারণা, চোর-ডাকাতের মতন অসুখের জীবাণুরাও সব সময় আমাদের চারপাশে ওত পেতে আছে। কখন যে তারা মুখ নাক দিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। সেইজন্য বাইরের কোনো জিনিস খাওয়া ওঁর মেয়েদের একদম বারণ।

একদিন আমি ছোটমাসির বাড়ির রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। দেখি কী, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোটমাসি, ও কে?'

ছোটমাসি বললেন, 'ও-ই তো আমাদের রান্নার ঠাকুর!'

'ওর মুখ বাঁধা কেন?'

'বাঃ, মুখ বাঁধা থাকবে না? আমার রান্নাঘরে মুখ-খোলা কারুকে ঢুকতে দিই না। মনে কর, দুধ জ্বাল দিচ্ছে, কিংবা ঝোল রাঁধছে, এমন সময় আপন মনে কথা বলে ফেলল! আর কথা বললেই একটু থুতু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে! তাহলে ওদের সেই থুতুমাখা জিনিস আমরা খাব?'

'রান্না করতে করতে আপন মনে কথা বলবে কেন?'

'যদি বলে? হঠাৎ বলে ফেলতেও তো পারে!'

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'আমরা কথা বলার সময় তো থুতু বেরোয় না।'

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, 'একটু-একটু বেরোয়, চোখে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য-বইতে লেখা আছে।'

আর একদিন দেখেছিলাম ও বাড়ির বাজার করা। সব বাড়ির লোকেরা বাজারে যায় থলি নিয়ে। আর ছোটমাসির চাকর যায় একটা বড় প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে, সেটায় আবার জল ভরা থাকে। সেই বালতিতে করে আনা হয় জ্যান্ত মাছ। ছোটমাসি তখন দাঁড়িয়ে থাকেন দোতালার বারান্দায়। চাকর বালতি থেকে মাছটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তখন মাছটা যদি দু'তিনবার লাফায় তাহলে ছোটমাসি খুশি। আর যদি বেচারা মাছটা লাফাতে না পারে অমনি ছোটমাসি বলবেন, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়।

ছোটমাসিদের দুধ নেওয়া হয় বাড়ির সামনেরই একজন গোয়ালার কাছ থেকে। দুধ দোয়াবার সময় ছোটমাসি রোজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে একফোঁটাও জল মেশানো না হয়। এ-ব্যাপারে তিনি ঠাকুর-চাকরদেরও কিচ্ছু বিশ্বাস করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আর একটা কাণ্ড করেন। সেটা অবশ্য নিজে দেখিনি, তবে শুনেছি। দুধ দোয়াবার আগে নাকি ছোটমাসি রোজ সেই গরুকে দশখানা জেলুসিল ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাইয়ে দেন। গরুর যদি অম্বল হয়, তাহলে সেই দুধ খেয়ে ওঁর মেয়েদেরও অম্বল হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

BanglaBook.org

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটে তো অনেক নোংরা থাকে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গন্ধও নাকে ঢুকে যায়। রাস্তায় বেরুলে নিশ্বাস তো নিতেই হবে! সেইজন্য ছোটমাসি মেয়েদের নাকেরও ব্যায়াম করান।

প্রত্যেক শনি-রবিবার ছোটমাসি দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যান ঠাকুরপুকুর। সেখানে ওঁদের আর-একটা চমৎকার বাড়ি আছে। সাদা রঙের তিনতলা বাড়ি, মস্তবড় বাগান, সবটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একদিকের দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। এখানে থাকেন রুমু-ঝুমুর দাদু আর দিদিমা।

এখানে ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে আসেন টাটকা হাওয়া খাওয়াতে। এখানে ধুলোবালি নেই, কাছাকাছি কোনো কলকারখানা নেই বলে বাতাসে ধোঁয়া নেই, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমাসি রুমু-ঝুমুকে নিয়ে চলে আসেন সেই বাড়ির ছাদে। তারপর তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেন, 'নিশ্বাস নে। ভাল করে নিশ্বাস নে!'

ঠিক ড্রিল মাস্টারের মতন ছোটমাসি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, 'নিশ্বাস নে, এবার ছাড়, ছাড়। আবার নে!'

খানিকক্ষণ এরকম করার পর ছোটমাসি বলেন, 'এবার হাঁ করে খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফ্যাল! এরকম টাটকা হাওয়া তো কলকাতায় পাবি না!'

রুমু-ঝুমু মায়ের সব কথা শুনে যায় লক্ষ্মী মেয়ের মতন। ওরা বুঝে গেছে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ছোটমাসির মনটা বড্ড নরম, কেউ ওঁর কথায় কোনোদিন প্রতিবাদ করলেই উনি অমনি কেঁদে ফেলেন!

এত সব করেও রুমু-ঝুমুর চেহারা বেশ সুন্দর হয়েছে, পড়াশুনাতেও ওরা ভাল। ছোটমাসির বাড়াবাড়ি দেখে আমরা মাঝে-মাঝে হাসাহাসি করি বটে, তাতে কিন্তু ছোটমাসি চটে যান না। নিজেও হেসে ফেলে বলেন, 'তবুও দ্যাখ না, এত সাবধানে থেকেও কি সবসময় ভাল জিনিস পাওয়ার উপায় আছে? সেদিন ওদের খাওয়ার জন্য বেছে বেছে ছোলা ভিজিয়ে দিলুম, তারপর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখি কী, একটা ছোলা পোকায় ফুটো করা।'

একদিন আমি ছোটমাসিদের বাড়িতে দুপুরে বেড়াতে গেছি। ছোটমাসি তখন স্নান করছিলেন। বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ দুটি কপালে উঠে গেছে, মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন।

আমিও ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

BanglaBook.org

ছোটমাসি বললেন, 'হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আর তারপরই যা বুকটা কাঁপতে লাগল '

'কী কথা?'

'তুই জানিস, পৃথিবীর তিনভাগ জল তার একভাগ স্থল?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম । এটা আবার একটা নতুন কথা নাকি? এতে ভয় পাবারই বা কী আছে।

আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে?'

ছোটমাসি বললেন, 'পৃথিবীর তিনভাগ জল এটা আগে খেয়াল করিনি! তার মানে আমার মেয়েরা তো কখনোও-না-কখনো জলের ধারে যাবেই। এদিকে আমি ওদের সাঁতার শেখাইনি। ওরা ডুবে যাবে যে। কালই যদি ডুবে যায়?'

আমি হাসতে লাগলাম।

ছোটমাসি বললেন, 'ধর, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল হল। তারপর বিলেত-আমেরিকায় গেল.....'

আমি বললাম, 'তা তো যেতেই পারে।'

"তখন সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে...মনে কর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে, হঠাৎ প্লেনটা ভেঙে গেল, আর ওরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে তখন। যদি সাঁতার না জানে, উরিব্ বাবাঃ কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হবে।'

'বালাই ঘাট, ওদের প্লেন কেন ভাঙবে । তবে যদি প্লেন ভেঙেই যায়, তখন অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়লে

'প্যারাসুট থাকবে তো । প্লেনে প্যারাসুট থাকে না । প্যারাসুটে করে জলে নামবে, তারপর তো সাঁতার জানতে হবে!'

আমি কল্পনা করতে লাগলুম প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে আমাদের রুমু আর ঝুমু নামছে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারপর জলপরীদের মতন সাঁতার কাটতে লাগল।

'যদি জাহাজে করে যায়, জাহাজও তো ফুটো হয়ে যেতে পারে।'

'তা তো বটেই।'

'পরশু থেকে ওদের গরমের ছুটি। পরশু থেকেই আমি ওদের সাঁতার শেখাব।'

'ঠিক আছে, আমিই সাঁতার শিখিয়ে দেব ওদের।'

BanglaBook.org

'তুই সাঁতার শেখাবি? কোথায়?'

'কেন, গঙ্গায়।'

'গঙ্গায়? সাঁতার না শিখেই কেউ গঙ্গায় নামে। রোজ কত লোক ডুবে যায়।'

'তাহলে বালিগঞ্জের লেকে।'

'ধ্যুৎ, ওখানে একগাদা লোক সাঁতার কাটে। কত রকম নোংরা থাকে জলে....।'

ছোটমাসি উঠে পড়ে লেগে গেলেন তাঁর দুই মেয়ের সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা করতে। যে-কোনো জায়গায় তো ছোটমাসি মেয়েদের সাঁতার শেখাতে রাজি হতে পারেন না। একদম পরিষ্কার জল চাই, সেই জলে আবার ওষুধ ফেলতে হবে। তার আগে মেয়েদেরও নিতে হবে নানারকম ইঞ্জেকশান।

ছোটমাসির নানান জায়গায় চেনাশুনো। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা করে ফেললেন কলকাতার খুব বড় একটা ক্লাবের সুইমিং পুলে। তা অন্য সকলের সঙ্গে নয়। খুব ভোরবেলা যখন কেউ যায় না, সেই সময় আগের দিনের জলের বদলে নতুন জল ভরা হবে, তাতে মেশাবেন ছোটমাসি তাঁর নিজস্ব ওষুধ। এবং সাঁতার শেখাবার জন্য ছোটমাসি ঠিক করলেন একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে। ছোটমাসির ধারণা, যারা ইংরিজি বলে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রুমু-ঝুমু এর আগে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য না হলেও, সাঁতার শিখতে রাজি হল না। দুজনেই বলল জলে নামতে ওদের ভয় করে।

এদিকে ছোটমাসি একটা জিনিস ধরলে কিছুতেই সেটা মাঝপথে ছাড়েন না। ওদের কত করে বোঝালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এত ভয় কিসের? দেখবি একদিন-দুদিন নামলেই ভয় কেটে যাবে। ভাল ট্রেনার থাকবে। দরকার হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

মেয়েরা তবু শুনতে চায় না। কাচুমাচু মুখ করে বলতে লাগল, এ বছর না, পরের বছর।'

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, এখন মেয়েরা রাজি না হলে কি চলে? কত কষ্ট করে ছোটমাসি সেই ক্লাবের লোকদের রাজি করিয়েছেন আলাদা ব্যবস্থা করবার জন্য। সুতরাং ছোটমাসি কাঁদতে শুরু করলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'আমি তোদের ভালর জন্য এত সব করি। আর তোরা আমার কথা শুনবি না। সাঁতার না শিখলে কবে হঠাৎ ডুবে যাবি—পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল।'

BanglaBook.org

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রুমু-ঝুমুকে রাজি হতেই হল।

যেদিন প্রথম সাঁতার শিখতে যাওয়া হবে সেদিন আমিও ভোরবেলা গিয়ে হাজির হলাম। ওদের উৎসাহ দিতে হবে তো। রুমু-ঝুমুর মুখচোখে খুব ভয়-ভয় ভাব। তখনও বলছে, 'মা, আজ না গেলে হয় না? বড্ড ভয় করছে।'

ছোটমাসি খুব নরম গলায় বললেন, 'দেখিস, কোনো ভয় নেই। আমি তো পাশেই থাকব।'

সেই ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে রুমু আর ঝুমু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। ওদের ট্রেনার মেয়েটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক। আমরা আরও বেশি অবাক। ভয়ের চোটে রুমু-ঝুমুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

ছোটমাসি বললেন, 'ওমা, তোরা ওরকম করছিস কেন? ভয় নেই! ভয় নেই!'

ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ছোটমাসি বললেন, 'থাক থাক, ভয় পাচ্ছে। ওদের নামতে হবে না।'

রুমু আর ঝুমু অমনি লাফিয়ে পড়ল জলে। ছোটমাসি আঁতকে উঠলেন যেন।

তারপরই দেখলাম একটা মজার দৃশ্য। ট্রেনার মেয়েটি ওদের দু'জনকে ধরতে আসতেই ওরা পাশ কাটিয়ে ঝপাস ঝপাস করে সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল। খুব পাকা সাঁতারুর মতন।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটিও হেসে উঠল। ছোটমাসি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল। মেয়েটি হাসছে কেন?'

আমি বললাম, 'ওর বোধহয় হাসিখুশি স্বভাব!'

তারপর ছোটমাসি বললেন, 'ওরা অতদূর চলে গেল কী করে? সাঁতার না জেনেও সাঁতার কাটছে?'

আমি বললাম, 'তোমারই মেয়ে তো। তুমি খুব ভাল সাঁতার জানো, তাই ওদের আর শেখার দরকার হয়নি!'

রুমু-ঝুমু এই সময় টুপ করে ডুবে গেল। আর ওঠেই না, ওঠেই না। তখন ছোটমাসি খুব ভয় পেয়ে নিজেই শাড়ি-টাড়ি পরা অবস্থায় জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁর হাত টেনে ধরলাম। রুমু-ঝুমু ডুব-সাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভুশ্ করে আবার মাথা তুলল।

এবার ছোটমাসি বুঝলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা, ওরা সাঁতার জানে! এই তোরা কোথায় সাঁতার শিখলি? কবে শিখলি?'

BanglaBook.org

রুমু-ঝুমু চিত-সাঁতার কাটতে কাটতে উত্তর দিল, 'ঠাকুরপুকুরে।'

ছোটমাসি আরও অবাক হয়ে বললেন, 'ঠাকুরপুকুরে ওরা কোথায় সাঁতার শিখল?'

আমি বললাম, 'ঠাকুরপুকুর নাম যখন, নিশ্চয়ই সেখানে অনেক পুকুর আছে।'

ছোটমাসি বললেন, 'পুকুর কোথায়? আমাদের ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে একটা নোংরা ডোবা আছে। সেটা তো পানায় ভরা, কেউ নামে না!'

রুমু-ঝুমু বলল, 'আমরা সেটাতেই সাঁতার শিখেছি।'

'কে শেখাল?'

'কেউ শেখায়নি! নিজে-নিজে!'

ছোটমাসি ধপাস করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বললেন, 'হায় হায়, কী হবে? একা-একা সাঁতার শেখা—কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! আর ঐ বিচ্ছিরি নোংরা পুকুর, কতকাল ওর জল পরিষ্কার করা হয় না, সেটাতে নেমেছে আমার মেয়েরা। ওরা বেঁচে আছে কী করে? হ্যাঁরে নীলু, কী হল বল তো।'

আমি বললাম, 'সত্যিই তো ওরা বেঁচে আছে কী করে! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!'

রুমু-ঝুমু তখন মনের আনন্দে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে!

BanglaBook.org

ডাকাতের পাল্লায়

ভুটানে বেড়াতে গিয়ে একদিনও খবরের কাগজ পড়িনি। পাহাড়, নদী আর আকাশ দেখেই চোখ ভরে থাকতো। ছাপা অক্ষর পড়ার কাজ থেকে চোখ দুটোকে ছুটি দিয়েছিলাম।

তারপর একদিন ভুটান থেকে আমরা নেমে এলাম সমতলে। উঠলাম গিয়ে বরভাবরি বাংলোয়। সেখানে আর দুদিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা।

সেই বাংলোয় বসবার ঘরে দেখলাম একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। অমনি পুরনো অভ্যেসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। টেনে নিলাম কাগজটা।

তাতে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। সেবক রোডে গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ডাকাতি হয়ে গেছে!

বাংলোর চৌকিদার কাছেই ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি শুনেছো ডাকাতির কথা?'

সে চোখ বড় বড় করে বললো, 'ওরে বাবা, সে কথা আর বলবেন না, সাহেব! সন্ধের পর আজকাল আর কেউ রাস্তায় বেরোতেই চায় না। একে এদিকে রয়েছে পাগলা হাতির উপদ্রব, তার ওপর শুরু হয়েছে ডাকাতের হামলা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে এই ডাকাতরা?'

চৌকিদার বললো, 'এরা কোথা দিয়ে যে কখন আসবে তা বোঝার উপায় নেই। এরা লুকিয়ে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। রাত্তির বেলা হঠাৎ বড় রাস্তার ওপর একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে গাড়ি আটকে দেয়। তারপর তিন চার জন বন্দুক হাতে নিয়ে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বাধা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলে। এ পর্যন্ত দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরেছে। পুলিশ এদের কিছুতেই ধরতে পারছে না।'

খবরের কাগজেও দেখলাম, প্রায় ঐ কথাই লিখেছে। তবে, দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরে ফেলার কথাটা সঠিক নয়, তারা আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। আর একটা গাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

ডাকাতরা সংখ্যায় মাত্র তিন-চার জন। ছোট ছেলেদের যেমন খেলবার মুখোশ পাওয়া যায়, তারা সেই রকম মুখোশ পরে থাকে। পুলিশ এখনো কোন খোঁজ পায়নি।

আমি খবরের কাগজটা টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেললাম। ঝর্না মাসী দেখে ফেললে আবার মুশকিল হবে। কারণ, আমাদের ফিরতে হবে ঐ সেবক রোড দিয়েই।

BanglaBook.org

কিন্তু ঝর্না মাসীর ছেলে বুবুন শুনে ফেলেছিল আমার আর চৌকিদারের কথাবার্তা। সে খাবারের টেবিলে বসে হঠাৎ বলে ফেললো, 'মা, আজ সন্ধেবেলা ডাকাত দেখতে যাবে? এখানে রোজ মুখোশ পরা ডাকাত বেরোয়।'

আর চেপে রাখা গেল না। ডাকাতদের কথা এসে পড়লোই। মেসোমশাই বললেন, 'আমিও শুনেছি, খুব ডাকাতি হচ্ছে এদিকে। গেটের সামনে কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল। পরশুদিন নাকি তিস্তা ব্রীজ পেরিয়ে মাইলখানেক দূরে সেবক রোডের ওপর একটা ডাকাতি হয়েছে।'

ঝর্না মাসী বললেন, 'তাহলে আমরা কুচবিহার দিয়ে যাবো।'

মেসোমশাই বললেন, 'কেন?'

ঝর্না মাসী বললেন, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যেতে হলে সন্ধের পর ঐ সেবক রোড দিয়ে যেতে হবে। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সঙ্গে এত জিনিস পত্তর।'

এই রে, ঝর্না মাসী একবার গোঁ ধরলেই মুশকিল। কুচবিহার দিয়ে যাওয়া মানে এক ঝামেলা। অনেক সময় লেগে যাবে। আর এ দিক দিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে দিয়ে দার্জিলিং মেল ধরলে আমরা পরদিন ভোরেই কলকাতায় পৌঁছে যাবো।

বুবুন বললো, 'না মা, আমরা ঐ ডাকাতের রাস্তা দিয়ে যাবো। আমরা ডাকাত দেখবো।'

ঝর্না মাসী এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্ তো। বড় দুষ্টু হচ্ছিস দিন দিন।'

কাছাকাছি একটা চা-বাগানের ম্যানেজার মেসোমশাইয়ের বন্ধু। পরদিন দুপুরে আমরা নেমন্তন্ন খেতে গেলুম তাঁর বাংলোয়।

কথায় কথায় ডাকাতের প্রসঙ্গ উঠলো।

ম্যানেজারের নাম অজয়বাবু। তিনি বললেন, 'আপনারাও ডাকাতের কথা শুনে ভয় পেয়েছেন নাকি?'

ঝর্না মাসী বললেন, 'ভয় পাবো না? ডাকাতদের কে না ভয় পায়!'

বুবুন বললো, 'আমি ভয় পাই না।'

অজয়বাবু বুবুনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এই তো চাই।'

তারপর তিনি ঝর্না মাসীর দিকে ফিরে বললেন, 'বাঘ, হাতি আর ডাকাতদের নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। আমাদের কী আর ওসবে ভয় পেলে চলে?'

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা আজ ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরবো ভেবেছিলাম, কিন্তু চিন্তা হচ্ছে।'

BanglaBook.org

অজয়বাবু বললেন, 'চিন্তার কী আছে? আমার জিপ গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। যদি ডাকাতরা আসেও, জিপ গাড়ি দেখলেই ভাববে পুলিশের গাড়ি, অমনি পালাবে। যদি চান তো আমার বন্দুকটাও দিয়ে দিতে পারি সঙ্গে।'

বুবুন বলল, 'হ্যাঁ বন্দুকটা চাই। ডাকাত এলেই গুড়ুম গুড়ুম করে গুলি করে দেবো!'

ঝর্না মাসী বললেন, 'বন্দুক তো দেবেন, কিন্তু সেটা চালাবে কে?'

অজয়বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, আপনারা কেউ জানেন না?'

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, কোনদিন আমি একটা সত্যিকারের বন্দুক হাতে নিয়েই দেখিনি। মেসোমশাই নাকি এক কালে শিকার করতেন। কিন্তু ঝর্না মাসী সে কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং মেসোমশাইও চুপ করে রইলেন।

অজয়বাবু বললেন, 'সে দরকার পড়লে আমার ড্রাইভারই বন্দুক চালাতে পারবে। দরকার হবে না অবশ্য...আমি নিজেই আপনাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমার আবার একটা বিশেষ কাজ আছে

বিকেল থাকতে থাকতেই আমরা জিপ গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝর্না মাসী বললেন, 'না হয় বেশিক্ষণ স্টেশনে বসে থাকবো, কিন্তু সন্ধের পর ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার দরকার নেই।'

রাস্তাটা কিন্তু চমৎকার। দু'পাশে চা বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গেছে এঁকে-বেঁকে। সমতলভূমি ছাড়িয়ে এক সময় পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে হয়। তারপর তিস্তা নদীর ওপর করোনেশান ব্রীজ। এমন সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে। বিরাট চওড়া এখানে তিস্তা নদী, ঠিক যেন রুপো গলা জল। ব্রীজ পেরিয়ে ডান দিকে গেলে কালিম্পং-এর রাস্তা। আমরা যাবো ডান দিকে।

বিকেল শেষ হয়েছে, হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। এসব পাহাড়ী জায়গায় আস্তে আস্তে সন্ধে নামে না। যাই হোক, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো।

সারাটা রাস্তা বুবুন ব্যাকুলভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে। তার খুব আশা ছিল যে কোন মুহূর্তে পাশের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি কিংবা একদল ডাকাত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সে রকম রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটলো না।

আমাকে সে বার বার জিজ্ঞেস করছিল, 'ও নীলুদা, বলো না, ডাকাতদের কী রকম দেখতে হয়?'

ওর ধারণা, ডাকাত বুঝি ভূত বা দৈত্যের মতন আলাদা ধরনের কিছু।

BanglaBook.org

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বড় বড় কান, চোখ দুটো দিয়ে আগুন জ্বলে, ডাকাতদের হাতে নোখও থাকে খুব বড় বড়...'

পাহাড়টা সবে পার হয়ে আমরা সমতল রাস্তায় এসেছি, এমন সময় ঘ্যাস্-স ঘ্যাস্-স আওয়াজ করে আমাদের জিপ গাড়িটা থেমে গেল।

ঝর্না মাসী আঁতকে উঠে বললেন, 'কী হলো? কী হলো?'

ড্রাইভারটি নেপালী এবং খুব গম্ভীর। সে কোন কথা না বলে রেগে গিয়ে গাড়ির বনেট খুললো। তারপর খুটখাট করতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

ঝর্না মাসী বললেন, 'কী হলো, এই নীলু, নেমে দ্যাখ না!'

বাইরে শীতের ফিনফিনে হাওয়া, তাই নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আর না নেমে উপায় নেই। ড্রাইভারটির পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া হুয়া? কতক্ষণ বাদ চলে গা?'

ড্রাইভার খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'নেই চলে গা।'

—'অ্যাঁ?'

ততক্ষণে মেসোমশাইও নেমে এসেছেন, আমার চেয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যাপার তিনি ভালো বোঝেন। তিনি ভালো করে দেখে বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।'

গাড়ির রেডিয়েটার ফুটো হয়ে সব জল পড়ে গেছে রাস্তায়। আর ফ্যান বেল্টও ছিঁড়ে গেছে। এখন এই গাড়ি চালাবার আর কোনো উপায়ই নেই।

ছোট মাসী সে খবর শুনে দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার ঐ অজয়বাবুটার কী আক্কেল? এরকম একটা পচা গাড়ি দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে!'

মেসোমশাই বন্ধুর সমর্থনে দুর্বলভাবে বললেন, 'আহা যন্ত্রপাতির কথা কি বলা যায়, কখন কোন্‌টা খারাপ হয়!'

'এখন কী উপায়?'

মেসোমশাই ছোট মাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এদিক থেকে আরও গাড়ি যাবে তো, তাদের কাউকে বললে আমাদের নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই!'

ঝর্না মাসী জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এখানে জঙ্গলের মধ্যে কে তোমার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকবে?'

ঝর্না মাসী আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই আবার হাসছিস? তোর লজ্জা করছে না? তখনই আমি বলেছিলাম কুচবিহার দিয়ে যেতে—'

BanglaBook.org

এ রাস্তায় গাড়ি চলাচল সত্যি খুব কমে গেছে। অন্য সময় লরি আর প্রাইভেট গাড়ি যায়। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে একটাও গাড়ি এলো না। সবাই কি ডাকাতের ভয় পেয়েছে? লরি তো কখনো বন্ধ হয় না। অন্তত একটা পুলিশের গাড়ি এলেও তো পারতো!

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। একটু কাছে আসতে দেখা গেল ট্রাক। একটা নয়, পর পর তিনটে। আমরা হল্লা করতে লাগলাম, 'এই থামো থামো, আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, থামো!'

তারা তো থামলোই না, বরং যেন আরও স্পীড বাড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার দুটো ট্রাক এলো পর পর। এবার আমরা আরও জোরে চ্যাঁচালাম, এবারও তারা না থেমে চলে গেল একই ভাবে।

আবার অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ির আলো যেই দেখলাম, অমনি আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলাম তিনজন। ছ'হাত তুলে চ্যাঁচাতে লাগলাম। আর যাই হোক, আমাদের তো চাপা দিতে পারবে না!

প্রায় চাপাই দিচ্ছিল আর একটু হলে । শেষ মুহূর্তে আমরা লাফিয়ে পড়লাম রাস্তার পাশে, ট্রাকটাও ব্রেক কষলো। আমি দৌড়ে ড্রাইভারের জানালার কাছে গিয়ে বললাম, 'বহুত বিপদে পড়া হ্যায়... হাম লোককো ট্রেন পাকড়ানে হোগা, গাড়ি খারাপ হুয়া....'

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে আমার মুখে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। গাড়িটাও এর মধ্যে স্টার্ট নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

ঝর্না মাসী বললেন, 'কী পাজী, কী শয়তান ওরা! নীলু, তোর বেশি লাগেনি তো?'

ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে আমি বললাম, 'একটা জিনিস বোঝা গেল, কোন গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে না। দিনকাল খারাপ বলে অচেনা লোককে কেউ তুলতে চাইছে না।'

এবার মেসোমশাইয়ের মুখটা কালো হয়ে এলো। কোন গাড়ি যদি আমাদের না নিয়ে যায়, তা হলে কী উপায় হবে? জিপটাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে চালাবার কোন উপায়ই নেই। সারা রাত কি তাহলে আমরা পথের পাশে বসে থাকবো?

দু'পাশে ঘন জঙ্গল । রাত্রিবেলা অন্ধকার জঙ্গলে গা ছমছম করে। এদিকে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। অবশ্য দু' একটা বাঘ ছিটকে চলেও আসতে পারে। আর আসতে পারে হাতি। অনেক সময়ই এই সব জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়। কিছুদিন আগেই আমরা জয়ন্তিয়ার কাছে দেখেছি যে হাতির দঙ্গল এলেই সেখানে

BanglaBook.org

একটা আধটা বন্দুক থেকেও বিশেষ লাভ নেই। তাদের খেয়াল হলে তারা আমাদের সবাইকে পায়ের তলায় পিষে চ্যাপ্টা করে দিয়ে যেতে পারে!

এছাড়া ডাকাতের ভয় তো আছেই। সারা রাত আমাদের এখানে ডাকাতের ভয় নিয়ে বসে থাকতে হবে।

তার চেয়েও বড় ভয় শীত। সারা রাত যদি জিপের মধ্যে বসে থাকতে হয় তা হলে আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাবো একেবারে। বাঘ, হাতি আর ডাকাতের ভয় নিয়ে এই দারুণ শীতের রাত কাটানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষত ঝর্না মাসী আর বুবুনকে নিয়েই চিন্তা।

অথচ আর কী-ই বা করার আছে ?

মেসোমশাই ঘড়ি দেখলেন। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে দার্জিলিং মেল ছেড়ে যাবে। অথচ সেখানে পৌঁছোবার কোন উপায়ই নেই। হঠাৎ তিনি খুব রেগে গিয়ে নেপালী ড্রাইভারকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, 'কাঁহে এইসা খারাপ গাড়ি লেকে আয়া?'

সে বললো, 'হাম্ কেয়া করেগা সাব!'

জঙ্গলে কিছু একটা আওয়াজ হলেও আমরা চমকে উঠছি।

শুকনো পাতার খসখস শব্দ, কে যেন হেঁটে আসছে! একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল। সেদিকে টর্চ ফেলেও আর কিছু দেখা গেল না। কেউ কি লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে?

ঝর্না মাসীও এখন আমাদের বকুনি দিতে ভুলে গেছেন।

বুবুন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। মেসোমশাই ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় উল্টোদিকের জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়।

আমি আর মেসোমশাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এই রকমভাবে কাটাতে হবে সারা রাত? এরকম চমকে চমকে? অথচ অন্য কী যে করা যায়, ভেবেই পাচ্ছি না।

এই সময় উল্টোদিকের রাস্তায় একটা হেড লাইটের আলো দেখা গেল। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমরা যেদিকে যাবো, গাড়িটা আসছে সেইদিক থেকেই। জোরালো আলো দেখেই বোঝা যায়, ওটাও একটা ট্রাক।

নেপালী ড্রাইভারটি হঠাৎ বললো, 'সাব, ট্রাক রোকে গা?'

মেসোমশাই বললেন, 'ট্রাক থামাবে? কি করে?'

BanglaBook.org

সে সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। তারপর দৌড়ে গিয়ে জিপ থেকে নিয়ে এলো বন্দুকটা। তারপর সে আর একটা কাজ করলো। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বার করে সেটা বেঁধে ফেললো মুখে। অমনি তার মুখখানা হয়ে গেল মুখোশের মতন।

সে আমাকে বললো, 'সাব, আপ ভি হামারা সাথ আইয়ে।'

তার কোমরে একটা ভোজালি ছিল। সেটা খুলে সে আমার হাতে দিল। তারপর ইঙ্গিতে বোঝালো, আমারও মুখে একটা রুমাল বেঁধে নিতে।

মেসোমশাই উত্তেজিতভাবে আবার ঘড়ি দেখে বললেন, 'দ্যাখো যদি ট্রাকটা থামাতো পারো, তা হলে এখনো দার্জিলিং মেল ধরা যেতে পারে।'

আমি আর নেপালী ড্রাইভারটি গিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। মেসোমশাই তখন ঝর্না মাসী আর বুবুনকে নিয়ে জিপের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

হেডলাইটের আলো ঠিক যখন আমাদের মুখে এসে পড়েছে, সেই সময় নেপালী ড্রাইভারটি বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে গুড়ুম করে একটা গুলি চালালো। আমার বুক টিপ টিপ করছে। ট্রাকটা যদি না থেমে আমাদের চাপা দিতে আসে তাহলে শেষ মুহূর্তে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমি তৈরী হয়ে ছিলাম।

কিন্তু ট্রাকটা থেমে গেল।

নেপালী ড্রাইভারটি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ড্রাইভারের কাছে ছুটে গিয়ে বললো, 'রুখ্ যাও? নেহি তো খতম কর দেগা।'

আমি অন্যদিকের জানালায় লাফিয়ে উঠে ভোজালি দেখিয়ে বললাম, 'খবরদার।'

ট্রাকের ড্রাইভার ভয় পেয়ে বললো, 'মারিয়ে মাৎ! মারিয়ে মাৎ!'

আমি আবার নেমে পড়ে চলে গেলাম পেছন দিকে। সেখানে প্রচুর মালপত্র রইলেও খানিকটা জায়গা খালি আছে। জিপ থেকে আমাদের মালপত্রগুলো এনে ছুঁড়ে দিলাম সেখানে। তারপর ঝর্না মাসী আর বুবুনকে টেনে হিঁচড়ে তুলে দিলাম ওপরে। মেসোমশাইও গিয়ে বসলেন ওদের পাশে।

আমি আবার ড্রাইভারের জানালার পাশে লাফিয়ে উঠে বললাম, 'গাড়ি ঘুমাও!'

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'আভি গাড়ি ঘুমাও!'

ড্রাইভারের পাশে একজন শুধু ক্লিনার বসেছিল। সে বেচারী একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। আমি তার গায়ে খোঁচা মেরে বললাম, 'এই হাট্‌কে বৈঠো না।'

BanglaBook.org

ড্রাইভার ট্রাকটা ঘোরালো খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। কিন্তু তার আপত্তি করবার উপায় নেই, কারণ কানের পাশেই বন্দুকের নল।

গাড়ি ঘোরাবার পর আমি বললাম, 'জোরসে চালাও।'

বাইরে বেশ কনকনে হাওয়া বলে আমি ভেতরে এসে বসলাম ভোজালি উঁচিয়ে। নেপালী ড্রাইভার বাইরেই রইলো, নইলে বন্দুকটা তাক করা যাবে না। আমার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই, তা হলে মুখ থেকে রুমালটা খুলতে হয়।

এখনো জোরে গেলে ট্রেনটা ধরতে পারি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। আমি ভোজালিটা একবার ড্রাইভারের চোখের সামনে ঘুরিয়ে বললাম, 'জোরসে চালাও! আউর বহুত জোর।'

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকের খোঁচা মেরে বললো, 'বহুত জোরসে।'

ট্রাক-ড্রাইভার ভাবলো, আমরা বুঝি পুরো ট্রাকটাই লুঠ করতে চলেছি।

দুর্দান্ত জোরে ছুটলো। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই দূরে দেখা গেল শহরের আলো। সে এবার একটু একটু টেরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। যেন সে অবাক হয়ে ভাবছে, শহরের মধ্য দিয়ে আমরা যাবো কী করে?

সে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেই তো আমরা ধরা পড়ে যাবো।

আমি আবার বললাম, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চলো। জোরসে। বহুত জোরসে।'

সে বললো, 'কেয়া? রেল স্টেশন?'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মুখের রুমালটা খুলে ফেললাম। নেপালীটিও বন্দুক নামিয়ে বললো, 'স্টেশান আগেয়া!'

সেদিন ট্রাক-ড্রাইভারটি ডাকাতের পাল্লায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে একশো টাকা বখশিশ পেয়েছিল অবশ্য।

BanglaBook.org

দুষ্টু

প্রথম যখন এলো এ বাড়িতে, তখন ওর মাত্র দেড় মাস বয়েস। ফুটফুটে চেহারা, জুলজুলে চোখ। যখন এদিক ওদিকে দৌড়োয়, তখন মনে হয় ঠিক একটা সাদা বল গড়ালো মাটির ওপর দিয়ে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

পুপ্‌লুই ওর নাম রাখলো দুষ্টু। ও পুপ্‌লুর নিজস্ব কুকুর। পুপ্‌লুর বাবা তেমন ভালোবাসেন না কুকুর, তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন একটু। কিন্তু পুপ্‌লুর মায়ের ইচ্ছে, বাড়িতে একটা কুকুর থাকে। পুপ্‌লুর সঙ্গে খেলা করবে।

কয়েকদিনের মধ্যে দুষ্টু সকলের মন কেড়ে নিল। সব সময় পায়ে পায়ে ঘোরে আর ভুক ভুক করে ডাকে। কী মিষ্টি ওর ডাকটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়, তাতে কিন্তু একটুও লাগে না।

তিন মাস বয়সের সময়ও দুষ্টু তেমন বড় হলো না। প্রায় একই রকম চেহারা। শুধু গলার আওয়াজটা একটু গম্ভীর হয়েছে। বারান্দায় কাক বসলেই সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। কাকগুলোও ভারি চালাক, তারা বারান্দার এক পাশ থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পাশে বসে। কাকেরা দুষ্টুকে ভয় পায় না, তারা ওকে নিয়ে খেলা করে।

সকালবেলা পুপ্‌লু যখন ইস্কুলে যায়, সেই সময় দারুণ ছটফট করে দুষ্টু। সে কিছুতেই থাকতে চায় না। সে বুঝতেই পারে না, পুপ্‌লু তাকে ছেড়ে একলা কোথায় চলে যাচ্ছে। তখন দুষ্টুকে জোর করে ধরে রাখতে হয়। এক একদিন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় অনেকটা।

সাড়ে তিনমাস বয়সের সময় দুষ্টু একদিন পালালো বাড়ি থেকে। পুপ্‌লু ইস্কুলে চলে গেছে, পুপ্‌লুর বাবা বেরিয়ে গেছেন অফিসে, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। এই সময় বাড়ির ঠিকে ঝি সদর দরজা খোলা রেখেছিল, দুষ্টু টুক করে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ খেয়ালই করেনি। পুপ্‌লু বারোটার সময় দুষ্টুর খাবার দিতে গিয়ে খুঁজে পেলো না। রেফ্রিজারেটারের তলাটাই দুষ্টুর লুকোবার প্রিয় জায়গা। সেখানে নেই, বারান্দায় নেই, ছাদে নেই। তা হলে কোথায় গেল?

পুপ্‌লুর মা ঠিকে ঝিকে বললেন, 'দেখে এসো তো, সিঁড়ির নিচে বসে আছে কি না?'

সেখানেও নেই দুষ্টু।

BanglaBook.org

পুপ্‌লুর মা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর ঠিকে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একেবারে মোড়ে পানের দোকানের সামনে তিনি দেখলেন একটা ভিড় জমে আছে। কাছে এসে তিনি দেখতে পেলেন দুষ্টুকে।

সারা গায়ে সাদা সাদা বড় বড় লোম, ছোট্ট খাট্টো কুকুর তবু তার কী তেজ। তিনটে রাস্তার কুকুর ঘিরে ধরেছে, তারই মাঝখানে লোম ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাচ্ছে দুষ্টু। লোকেরা মজা দেখছে।

পুপ্‌লুর মা এসে বললেন, 'এই দুষ্টু!'

রাস্তার লোকেরা বললো, 'এটা আপনাদের কুকুর? তাই বলুন। দেখেই মনে হয়েছিল এটা কারুর বাড়ির পোষা কুকুর।'

পুপ্‌লুর মা হাত বাড়িয়ে দুষ্টুকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। কিন্তু দুষ্টুটা এমন পাজী, সে এক লাফ মেরে খানিকটা দূরে সরে গেল। তারপর দৌড়াতে লাগলো পাশের রাস্তা দিয়ে।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ধর, ধর!'

কিন্তু দুষ্টু চলে যেতে লাগলো আরও দূরে। পুপ্‌লুর মা তো আর কুকুরের পেছনে পেছনে ছুটতে পারবেন না। তিনি কোনো ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। দুষ্টুটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে, যে কোনো সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত পাড়ার দরজির দোকানের একটা ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে খপ্‌ করে ধরে ফেললো দুষ্টুকে। দুষ্টু দু'তিনবার কামড়ে দিল তাকে, কিন্তু ছেলেটি ছাড়লো না।

পুপ্‌লুর মা ওকে কোলে তুলে নিলেন। বকুনি দিয়ে বললেন, 'দাঁড়া আজ তোকে এমন মারবো!'

দুষ্টু যেন তখন আর কিছুই জানে না। আদুরে গলায় ডাকতে লাগলো কুঁই কুঁই

সেদিন থেকে দুষ্টুর জন্য কেনা হলো বাকলস আর চেন। মাঝে মাঝে তাকে বেঁধে রাখা হয়; কিন্তু বাঁধা থাকাটা সে পছন্দ করে না, চাঁচায় অনবরত। সেই চ্যাঁচানি শুনে পুপ্‌লুর বাবা বিরক্ত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেন দুষ্টুকে।

সাড়ে পাঁচ মাস বয়েসের সময় দুষ্টু হঠাৎ বড় হয়ে উঠলো। এখন তার সামনে কোনো খাবার দেখালে সে ভাল্লুকের মতন দু' পায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। যখন-তখন সিগারেটের প্যাকেট আর কাগজ মুখে নিয়ে পালায়। অনেক কথা বোঝে, কিন্তু বুঝেও শোনে না অনেক কথা। সবাই বলে তার দুষ্টু নামটা সার্থক।

BanglaBook.org

বাইরের লোক এলেই দুষ্টু খুব জোরে জোরে ডেকে তেড়ে যায়। অনেকে ভয় পায়। পুপ্‌লুর মামাতো বোন টুয়া আর এ বাড়িতে আসতেই চায় না। পুপ্‌লুর বন্ধু রাজন বলে, 'আগে ভাই তোমার কুকুর বেঁধে রাখো, তারপর তোমার সঙ্গে খেলবো।'

একদিন পুপ্‌লুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল তিনটে লম্বা দাগ। সেখান থেকে কত রক্ত বেরিয়ে জমে আছে।

পুপ্‌লুর মা আঁতকে উঠে বললেন, 'ওমা, পুপ্‌লু, তোর ঘাড়ের কাছে ওরকম ভাবে কাটলো কী করে?'

পুপ্‌লুর বাবা বললেন, 'এ তো মনে হচ্ছে, দুষ্টু কামড়েছে!'

পুপ্‌লু বললো, 'না না, এমনি কেটে গেছে।'

—'এমনি এমনি ঘাড়ের কাছে কেটে যায়?'

—'হ্যাঁ, ছাদে খেলতে গিয়ে একটা তারের খোঁচা লেগেছিল।'

পুপ্‌লুর বাবা আর মা দু'জনেই বুঝে গেলেন যে, ওটা আসলে দুষ্টুরই কামড়ানোর দাগ। পুপ্‌লু তার নিজের কুকুরের দোষ চাপা দিতে চাইছে।

পুপ্‌লুর ঘাড়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো ডেটল। আর খুব বকুনি দেওয়া হলো দুষ্টুকে। বকুনি খেয়েই সে রেফ্রিজারেটরের তলায় লুকিয়ে পড়লো।

এরপর একদিন সে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর বাবাকেই। দুষ্টু একটা মাংসের হাড় নিয়ে এসেছিল পড়বার ঘরে, পুপ্‌লুর বাবা সেটি সরিয়ে নিতে যেতেই দুষ্টু খ্যাঁক করে কামড়ে দিল তার পায়ে। রক্ত বেরোয়নি অবশ্য, কিন্তু পুপ্‌লুর বাবা রেগে গিয়ে একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে খুব করে মারলেন তাকে। পুপ্‌লু ছুটে এসে বললো, 'বাবা, ওকে আর মেরো না। ও তো ছোট, তাই বোঝে না।'

এবার সে কামড়ালো পুপ্‌লুর মাকে। তিনি ওকে চান করিয়ে দিচ্ছিলেন। সাদা সাদা লোমগুলো ময়লা হয়ে গেছে। সাবান মাখিয়ে দিলে চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায়। সেই সাবান মাখাতে যেতেই সে খুব জোরে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর মাকে। রক্ত বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন বিকেলবেলা দুষ্টু যেই পুপ্‌লুর মায়ের সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, অমনি তিনি রাগ করে বললেন, 'যা, তুই যা এখান থেকে। তোর সঙ্গে আর কথা বলবো না।'

দুষ্টু অমনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নানারকম খেলা দেখাতে লাগলো। সে এমন মজার ভঙ্গি করতে লাগলো যে দেখলে না হেসে পারা যায় না। পুপ্‌লুর মা বারবার বলতে লাগলেন, 'যা, বেরিয়ে যা এ ঘর থেকে।' সে কিছুতেই যাবে না।

BanglaBook.org

পরদিনই সে কামড়ে দিল ডিমওয়ালাকে।

তারপর দিন নিচের তলার একটা বাচ্চা মেয়েকে।

তারও পরের দিন পিওনকে।

দুষ্টুকে নিয়ে আর পারা যায় না। যে যখন-তখন যাকে-তাকে তাড়া করে যায় কিংবা কামড়ায়। যদিও তাকে সব রকম ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে, কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। আবার অন্য সময় সে এমন ভালো হয়ে থাকে, এমন সব মজার মজার খেলা করে যে তখন তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে খুব। কামড়ে দেওয়াটাও যেন তার খেলা। বিশেষত বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়ে এলে সে কামড়াতে যাবেই। পুপ্‌লুর বন্ধুদেরও সে তেড়ে যায়। সে চায় পুপ্‌লু শুধু তার সঙ্গেই খেলা করবে। আর কারুর সঙ্গে নয়।

এরপর একদিন সে পাশের ফ্ল্যাটের দিদিমাকে কামড়ে দিতেই সবাই চটে গেল খুব। পুপ্‌লুর মা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেউ এই কুকুরটা নেবে?'

অনেকেই রাজী। একজন তো বললো, 'এমন সুন্দর কুকুরটা দিয়ে দেবেন? আমি এক্ষুনি নিতে রাজি আছি।'

পুপ্‌লুর মা বললেন, 'নিয়ে যাও।'

কিন্তু পুপ্‌লু তখন বাড়িতে সে এসে এমন চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে আর দেওয়া গেল না।

পরদিন সে আবার পুপ্‌লুর মাকে কামড়ালো।

আর এ কুকুর রাখা যায় না। সেদিন সকালে পুপ্‌লু স্কুলে গেছে, সে সময় একজন চেনা লোক এলো। পুপ্‌লুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই কুকুরটা নেবে?' সে তক্ষুনি রাজি। এত ভালো জাতের কুকুর কিনতে গেলে অনেক পয়সা লাগবে। বিনা পয়সায় পেয়ে সে খুব খুশি।

সত্যিই সে দুষ্টুকে নিয়ে চলে গেল।

পুপ্‌লুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই দুষ্টু বসে থাকতো দরজার সামনে। পুপ্‌লু এলেই লাফিয়ে পড়ত তার গায়ে। তখন থেকেই শুরু হতো খেলা। সেদিন দুষ্টুকে না দেখে পুপ্‌লু বললো, 'মা দুষ্টু কোথায়?'

মা বললেন, 'সে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে।'

পুপ্‌লু বললো, 'না, হারিয়ে যায়নি। তোমরা নিশ্চয় কাউকে দিয়ে দিয়েছো। কেন দিয়েছো?'

BanglaBook.org

মা বললেন, 'দ্যাখ, আজ আমার হাতে আবার কতটা কামড়ে দিয়েছে।'

পুপ্‌লু তবু মানলো না। সেদিন সে খেল না। খেলতে গেল না। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পুপ্‌লুর মায়েরও মনটা খারাপ হয়ে গেছে বেশ। এতদিন ধরে পুষলে মায়া পড়ে যায়। কত কথা মনে পড়ছে।

রাত্তিরবেলা অফিস থেকে ফিরে পুপ্‌লুর বাবা বললেন, 'দুষ্টু কোথায়?' তারপর নিজেই আবার বললেন, 'ও, তাকে তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় খালি খালি লাগছে বাড়িটা।'

মা বললেন, 'পুপ্‌লুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছু খেল না।'

বাবা বললেন, 'আমারও তো মন খারাপ লাগছে।'

মা বললেন, 'ফিরিয়ে আনবো নাকি? যে নিয়ে গেছে, সে যোধপুর পার্কে থাকে। বাড়িটা চিনি না।'

বাবা বললেন, 'থাক, আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই।'

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে, এমন সময় খট্ খট্ করে দরজায় একটা শব্দ। এত রাত্রে কে এলো? দরজা খুলতেই দুষ্টু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর। ডাকতে লাগলো কুঁই কুঁই করে।

পুপ্‌লু পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সবাই অবাক। সঙ্গে আর কেউ নেই। অতদূর যোধপুর পার্ক থেকে দুষ্টু কী করে চলে এলো রাস্তা চিনে?

মা বললেন, 'দুষ্টু, তুই আবার এসেছিস?'

দুষ্টু মায়ের ওপর গিয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। যেন সে ক্ষমা চাইছে। পুপ্‌লু তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে গেল নিজের ঘরে।

আশ্চর্য, তারপর থেকে আর একদিনও দুষ্টু কাউকে কখনো কামড়ায়নি।

BanglaBook.org

সুশীল মোটেই সুবোধ বালক নয়

সাহেব হুকুম দিলেন সুশীলকে চাবুক মারা হবে। সুশীলের বয়েস তখন পনেরো, তাই পনেরো ঘা কড়া চাবুক। জেলখানার চত্বরে যমদূতের মতন চেহারার প্রহরী লক্‌লকে চাবুক নিয়ে মারতে লাগলো শপাং শপাং করে। পাশে দাঁড়িয়ে একজন গুনছে এক, দুই, তিন...

পনেরো বছরের ছেলে সুশীল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো দয়া চাইলো না, কাঁদলো না। সে যে ব্যথা পাচ্ছে তাই বোঝা গেল না। তার ঠোঁটে অল্প হাসি, সে গুনগুন করে গান গাইছে, "আমায় বেত মেরে তুই মা ভোলাবি, আমি কী মার সেই ছেলে?"

মনে হয় রূপকথার গল্প। তা কিন্তু নয়। এখনো তেমন অনেক লোক বেঁচে আছে, যারা এই সব দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছে। প্রায় সত্তর বছর আগেকার ঘটনা।

তোমরা অনেকেই বোধহয় জানো যে একসময় ইংরেজরা ছিল আমাদের রাজা। এখন পৃথিবীতে পরাধীন দেশ প্রায় নেই-ই। কিন্তু এক সময় পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র দেশের রাজা পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ শাসন করতো। আমাদের দেশ দখল করেছিল ইংরেজরা। আমাদের ওপর তারা দারুণ অত্যাচার করতো। আর এদেশের সব জিনিস-পত্র নিয়ে যেত নিজেদের দেশে।

তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দেশের লোকেরাও প্রতিবাদ করতে শুরু করলে, ইংরেজদের তাড়াবার জন্য শুরু হল লড়াই। কত ভালো ভালো সাহসী ছেলেমেয়েরা যে সেই লড়াইতে প্রাণ দিয়েছে তার ঠিক নেই। তাদের জন্যই আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। অথচ তাদের অনেকের কথাই আমরা আজ মনে রাখিনি।

সেই রকম একজনের কথাই আজ আমি শোনাচ্ছি। সত্যি হলেও দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প। শেষ পর্যন্ত পড়লে তবে বুঝতে পারবে।

ছেলেটির নাম সুশীল সেন। ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। সে একদিন শিয়ালদার কাছ দিয়ে পায়ে হেঁটে আসছে, এমন সময় দেখলো কোর্টের কাছে খুব ভিড়। কী ব্যাপার? সে থমকে দাঁড়ালো।

সেই কোর্টে তখন একটা বিখ্যাত মামলা চলছে। তোমরা নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দর ছবি দেখেছো? এই শ্রীঅরবিন্দর নাম ছিল তখন শুধু অরবিন্দ ঘোষ এবং তিনি ছিলেন 'বন্দেমাতরম' বলে একটি পত্রিকার সম্পাদক। পুলিশ সেই পত্রিকার নামে মামলা এনেছে। সাক্ষী হিসেবে এনেছে আর একজন বিখ্যাত নেতা বিপিন পালকে। বিপিন

BanglaBook.org

পাল আদালতে এসে বেঁকে বসলেন। তিনি নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধে কিছুতেই সাক্ষী দেবেন না। তাই নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড! সেই মামলা দেখার জন্যই ভিড় করেছে অনেক লোক।

পুলিশ তখন ভিড় সরাবার জন্য লাঠি দিয়ে লোকজনকে মারতে শুরু করেছে। তখনকার ইংরেজ পুলিশ আমাদের দেশের লোকেদের তো মানুষ বলেই গণ্য করতো না। দুমদাম করে যখন খুশি পেটাতো। সার্জেন্ট যেই সুশীলকে এক ঘা মেরেছে, সেও উল্টে মেরেছে তার মুখে এক ঘুষি। সে মোটেই সহ্য করার ছেলে নয়, গায়েও খুব জোর। ঘুষি খেয়ে হকচকিয়ে গেল সার্জেন্ট। বাঙালীরা তো কখনো সাহেবের গায়ে হাত তোলবার সাহস দেখায় না। সে তখন লাঠি দিয়ে আবার খুব জোরে মারলো সুশীলকে। সুশীলও আবার তেড়ে এসে এক ঘুষি চালালো। তখন অনেকগুলো পুলিশ এসে সুশীলকে ঘিরে ধরে ফেললো। নিয়ে এলো সাহেব হাকিমের কাছে। হাকিম তো বাঙালীর ছেলের এই আস্পর্ধার কথা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুকুম দিলেন, মারো একে পনেরো ঘা চাবুক।

হাসিমুখে সহ্য করলো সুশীল সেই নির্যাতন। সাহেবরা দেখে নিক বাঙালীর ছেলেরা আর সাহেবদের ভয় পায় না।

সুশীলকে নিয়ে দেশের লোকের খুব গর্ব হলো। তাকে নিয়ে মিছিল বার করলো অনেকে মিলে। তখনকার দিনে আমাদের দেশের বড় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সোনার মেডেল পাঠিয়ে দিলেন সুশীলের জন্য।

যে-হাকিম সুশীলকে শাস্তি দিয়েছিল তার ওপর কিন্তু সুশীল খুব রেগে রইলো। এরকম অত্যাচারী সাহেবদের শেষ করতেই হবে। সাহেবকে মারার জন্য সে একটা ফন্দি বার করলো। একখানা খুব মোটা বইয়ের মধ্যে একটা বোমা পুরে পাঠিয়ে দিলো সাহেবের নামে। সাহেব যেই বইটা খুলবে অমনি বোমাটা ফেটে যাবে। কিন্তু সাহেবটির ভাগ্য ভালো, বইটা নিজে খোলবার আগেই একজন আর্দালি খুলে ফেললে।

প্রতিশোধের আগুন তখন সুশীলের মনের মধ্যে জ্বলছে। সে বুঝলো শুধু একজন সাহেবকে মারলে তো হবে না। সব সাহেবকে তাড়াতে হবে। সেজন্য বড় দল চাই। অনেক অস্ত্রশস্ত্র চাই। তার জন্য সে পুরোপুরি যোগ দিল বিপ্লবীদের দলে। দেশের লোককে তৈরী করা আর বোমা বানানোর কাজ চলতে লাগলো।

কয়েকমাস পরে সে ধরা পড়ে গেল পুলিশের হাতে। একই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাই, সত্যেন, উল্লাসকর, উপেন ব্যানার্জি ইত্যাদি বিখ্যাত বীরেরাও ধরা পড়েছিলেন। এদের মধ্যে সুশীলই সবচেয়ে ছোট।

BanglaBook.org

বিচারে তার সাত বছর জেল হলো। কিন্তু তাকে জেল খাটতে হলো না অবশ্য। হাইকোর্টে তিন বিচারকের মধ্যে বারবার মতের অমিল হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দেওয়া হলো তাকে।

এত বড় একটা শাস্তির হাত থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেলে অনেকেই ভাবে ওরেব্ বাবা, খুবই জোর বেঁচে গেছি, আর ওইসব কিছু করতে যাব না। সুশীল কিন্তু মোটেই সে রকম সুবোধ বালক ছিল না। যেমন তার সাহস তেমন তার গোঁ।

আবার সে গোপনে দল তৈরী করলো। সাহেব কয়েকজনকে বন্দী করেছে বলেই কি আর সবাই চুপ করে থাকবে? সেই বন্দীদের ছাড়ানো দরকার। নতুন ছেলেদের বিপ্লবী করে তোলা দরকার।

সুশীল দুটো জিনিস ঠিক করলো। এদেশেরই নেতা হয়ে যারা দেশের ক্ষতি করবে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। আর টাকা যোগাড় করতে হবে। গোপন দল চালাতে গেলে আরো টাকা লাগে। সে টাকা কোথা থেকে আসবে? যারা অত্যাচারী, যারা কৃপণ, তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাদের নাম ছিল তখন স্বদেশী ডাকাত।

সুশীল তার দল নিয়ে এ রকম অনেক বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিল। অনেক জায়গা থেকে স্বদেশী ডাকাতি করে টাকা যোগাড় করতে লাগলো। পুলিশ কিন্তু কিছুতেই তাকে ছুঁতে পারেনি। আর সে পুলিশের হাতে ধরা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

একবার কী কাণ্ড হলো শোনো! সুশীল এইসময় নদীতে নৌকোয় করে ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলে কৃপণ বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে এসে গরিবদের দেয়। এইরকমভাবে একদিন তারা নদীয়া জেলার দুটো গ্রাম থেকে দু'বার লুঠ করে নৌকোয় চেপে পালাচ্ছে। অনেকক্ষণ নৌকো চালিয়ে এসে যখন নিশ্চিন্ত হলো যে পুলিশ তাদের খোঁজ পায়নি, তখন দলের লোকেরা বললো, বড্ড খিদে পেয়েছে। খিদে তো পাবেই, দেড় দিন ধরে কিছু খাওয়া হয়নি।

নদীর ধারে নৌকো থামিয়ে তারা রান্না করতে বসলো। গ্রামের কয়েকজন লোক এরকম কয়েকটি অচেনা ছেলেকে দেখে সন্দেহ করলো। নিশ্চয়ই এরা ডাকাত। চুপিচুপি খবর দিল পুলিশকে। একদল পুলিশ এসে পড়লো হুড়মুড় করে। তখনো রান্না শেষ হয়নি। খাওয়া আর হলো না, সুশীলেরা নৌকোয় উঠে পড়লো। পুলিশ তখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে, ওরাও গুলি ছুঁড়ে তার উত্তর দেয়।

অন্ধকার রাত। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতরা পালিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু এরই মধ্যে দারুণ একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল।

BanglaBook.org

দুরন্ত সাহসের সঙ্গে সুশীল আর তার দু'তিনজন বন্ধু গুলি ছুঁড়ছে পুলিশের দিকে। হঠাৎ এক সময় সুশীলের পাশেই যে বন্ধুটি দাঁড়িয়েছিল তার পা পিছলে গেল। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তার হাতের পিস্তলটা ঘুরে গেল উল্টো দিকে। আর তার থেকে গুলি বেরিয়ে সোজা ঢুকে গেল সুশীলেরই পেটে।

সুশীল ধপাস করে পড়ে গেল জলে। দলের লোকেরা তো হতভম্ব। তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে আবার নৌকোয় টেনে তুললো। সুশীলের তখনো জ্ঞান আছে, কিন্তু সে বুঝে গেছে যে সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। যে বন্ধুর হাত ফস্‌কে গুলি লেগেছিলো তার পেটে তার ওপর সে একটুও রাগ করলো না। বরং কী করে বন্ধুরা পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে পালাতে পারবে, সেটাই হলো তার একমাত্র চিন্তা। সে ফিসফিস করে বললো, শোন, আমি জানি, আমি আর বাঁচবো না! আমি মরে গেলে তোরা আমার মৃতদেহটা সঙ্গে করে নিয়ে যাস না। তাতে কোন লাভ নেই, শুধু শুধু নৌকোটা ভারি হয়ে থাকবে। নৌকোটা হাল্‌কা করা দরকার। সেইজন্য আমার মৃতদেহটা জলে ফেলে দিস। তার আগে শরীর থেকে কেটে ফেলিস মুণ্ডুটা। দুটো আলাদা জায়গায় ফেলবি। আমার শরীরটা ভেসে উঠলেও পুলিশ চিনতে পারবে না.....

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল মরে গেল। বন্ধুরা কাঁদতে কাঁদতে সুশীলের কথা মতনই কাজ করলো। তখনো দূরে পুলিশ তেড়ে আসছে। বন্ধুরা নদীর এক জায়গায় একটা বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বেঁধে দিল ওর রুমালটা। ঐটুকুই সুশীলের স্মৃতিচিহ্ন।

এই ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক সাতষট্টি বছর আগে। ১৯১৫ সালের মে মাসে। তখন সুশীল সেনের বয়স মাত্র তেইশ।

যে-ইংরেজ হাকিম সুশীলকে প্রথম বেত মারার শাস্তি দিয়েছিল তার নাম কিংসফোর্ড। এই কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার জন্যই মজঃফরপুর পর্যন্ত তাড়া করে গিয়েছিল ক্ষুদিরাম। তোমরা নিশ্চয়ই শহিদ ক্ষুদিরামের কথা সবাই জানো। না কি জানো না? তাহলে আমি মনে খুব দুঃখ পাবো। না জানলে এক্ষুনি বাবা-কাকার কাছে জিজ্ঞেস করে নাও!

BanglaBook.org

সাতজনের তিনজন

হিমালয়ের খুব গহন অঞ্চলে দু'জন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন খুব রোগা, লম্বা আর শুকনো চেহারার বুড়ো; আর একজন বেশ শক্ত, সমর্থ, জোয়ান, কিন্তু তার মাথার চুলের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। কেউ এক সময় তার মাথার ঐ জায়গার চুল কেটে নিয়েছিল, সেখানে আর চুল গজায়নি।

হিমালয়ের এরকম জায়গায় কোনো মানুষজন দেখা যায় না। পর পর বিরাট বিরাট পাহাড়, যেন একেবারে আকাশচুম্বী, আর মাঝে মাঝে উপত্যকা। এছাড়া দারুণ গভীর সব খাদও আছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোয় বরফ, কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বন-জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই থাকে ঐ লোক দু'জন। ওদের বাড়ি ঘর কিছু নেই, রাত্তিরবেলা গাছতলায় ঘুমোয় আর সারাদিন টো-টো করে ঘোরে।

এখানকার জঙ্গলে ফলমূল বিশেষ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও খাওয়া যায় না, এমন বিস্বাদ। তবে কিছু খরগোশ আর হরিণ আছে। ওরা তাই মেরে খায়। বুড়ো লোকটির আর শিকার করার ক্ষমতা নেই। জোয়ানটির কাঁধে ঝোলে ধনুক আর কয়েকটা তীর ভর্তি তূণীর। এমনি জামা কাপড়ও নেই ওদের, গাছের বাকল দিয়ে কোনোরকমে পোশাক বানিয়েছে।

পরপর দু'দিন ওরা কোনো শিকার খুঁজে পায়নি। পেট জ্বলছে খিদেয়। এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে এসে ওদের মনে হচ্ছে সব জন্তু জানোয়ার বুঝি ওদের ভয়ে নিরুদ্দেশে চলে গেছে।

জোয়ানটি বললো, মামা, আর যে পারি না।

বুড়ো লোকটি বললো, ওরে আশু, আমিই কি আর পারছি! কিন্তু উপায় তো নেই, বেঁচে থাকতে হবেই, আর বাঁচতে হলে খাদ্যও খুঁজতে হবে।

আশু বললো, এই বন জঙ্গল আর ভালো লাগে না। চলো, সেখানে মানুষজন আছে, সেখানে যাই।

মামা বললো, খবরদার না! ও কথা বলিস না! লোকজনরা যদি আমাদের চিনে ফেলে? তবে সর্বনাশ হবে!

আশু বললো, এতকাল পরেও আমাদের কে চিনবে? ওঃ, খিদেয় আমার পেট একেবারে পুড়ে যাচ্ছে—চি-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

মামা চমকে উঠে বললেন, ওকি! অমন শব্দ করছিস কেন?

—খিদে পেলে আমার অমন হয়!

BanglaBook.org

—না না, ছি! অমন করতে নেই! ছোটবেলায় তোর ঐ দোষ ছিল, অনেক কষ্টে সারিয়েছি!

—চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ, মামা, আমি আর পারছি না, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

—আরে ছি ছি ছি ছি, অমন করে না। চল্-চল্ খাদ্য খুঁজে দেখি।

আর কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরলো ওরা। তারপর মামাই বেশি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়িটা নড়ে উঠলো!

মামা উল্টে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ভাগ্নে আশু তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলো ফেললো। মামা বলে উঠলো, ওরে বাপ রে, এটা কী রে?

সেটা আসলে একটা ময়াল সাপ। বনের শুকনো পাতায় তার মুখটা ঢাকা পড়ে আছে। এবার সে সরাৎ করে মাথাটা ঘুরিয়ে আনলো এদিকে।

ভাগ্নে আর মামা দু'জনেই কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে। মামা প্রথমে চমকে উঠেছিল, কিন্তু এখন আর মুখে বেশি ভয়ের চিহ্ন নেই।

ভাগ্নে ধনুকে তীর জুড়ে বললো, মামা, আজ এই সাপটাকে মেরে তারপর এটাকে পুড়িয়ে খাবে?

মামা বললো, আরে ছি ছি, রাম রাম! আমরা উচ্চ বংশের লোক, ব্রাহ্মণ, আমরা কখনো অসভ্য বুনো লোকদের মতন সাপ খেতে পারি?

ভাগ্নে বললো, এখানে কে আমাদের দেখতে যাচ্ছে?

মামা বললো, তাছাড়া এই সাপটা কোনো শাপগ্রস্ত মুনি-ঋষি কিংবা বিশিষ্ট লোক কিনা তাই বা কে জানে। ওকে মেরে কাজ নেই।

এমন সময় সাপটা মুখ ঘুরিয়ে এনে মামার একখানা পা কামড়ে ধরলো।

মামা তাতে একটুও ভয় না পেয়ে হাসতে হাসতে বললো, ওরে, তা হলে এটা মুনি-ঋষি নয়, আসল সাপ!

ভাগ্নে তখন সাপটার মাথায় একটা ধারালো তীর ছুঁড়লো। সাপটা অমনি মামার পা ছেড়ে দিয়ে ছটফট করতে লাগলো যন্ত্রণায়।

ভাগ্নে সাপটাকে একেবারে মেরে ফেলবার জন্যে আর একটা তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিল, মামা তাকে বাধা দিয়ে বললো, ওরে আশু, থাক থাক! আর মারবার দরকার নেই। আমরা সত্যিই তো আর সাপ খাবো না। চল।

BanglaBook.org

সাপটা যে মামার পায়ে কামড়ে দিয়েছে, তাতেও মামার পায়ে একটু দাঁতও বসেনি, রক্তও বেরোয়নি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাগ্নেকে মামা টানতে টানতে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুরে কিছুই না পেয়ে বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা খাদের ধারে বসলো। তারপরই চমকে উঠলো একটা গাছের দিকে তাকিয়ে।

গাছটা উঠেছে একেবারে খাদের ধার ঘেঁষে। গাছটা বেশ বড়, লম্বা ধরনের, সোজা উঠে গেছে। নিচে কোন ডালপালা নেই, একেবারে ডগার কাছে দুটি মাত্র ডাল, তাতে কয়েকটি ফল ফলে আছে। গাছটাকে দেখতে অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের মতন, আর ফলগুলো আমের মতন। এমন আশ্চর্য গাছ এই জঙ্গলে আর একটাও নেই।

মামা বলে উঠলো, আরে।

ভাগ্নে বললো, এতক্ষণে বাঁচলুম, এবার খিদে মেটাবো, চি-হিঁ-হিঁ।

মামা বললো, চুপ কর। এটা কি গাছ জানিস? বহু ভাগ্যে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম মৃতসঞ্জীবনী, এ গাছের ফল খেলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।

ভাগ্নে বললো, মরা মানুষের কথা আমরা জানি না। এই ফল খেলে পেট তো ভরবে। চিঁ-হিঁ-হিঁ!

মামা বললো, ছিঃ আশু, এমন আওয়াজ করে না। ফলগুলো কী করে পাড়া হবে, সেই কথা ভাব। ঐ একটা ফল খেলেই আমাদের পেট ভরে যাবে।

গাছটায় ওঠা অসম্ভব। নিচে কোনো ডালপালা নেই, গা-টা মসৃণ। ফলগুলো এমন পাকা যে দেখলেই লোভ হয়।

ভাগ্নে বললো, সে আমি ব্যবস্থা করছি।

সে অমনি ধনুকে তীর জুড়লো। তারপর এক চোখ বন্ধ করে ছুঁড়লো তীর। ভাগ্নের হাতের টিপ বেশ ভালোই, তীরটা গিয়ে বিঁধলো একটা ফলে। কিন্তু ফল-সমেত তীর মাটিতে না পড়ে গিয়ে পড়লো খাদে।

ভাগ্নে বললো, এই রে।

মামা বললো, ইস, অমন দামী ফল তুই নষ্ট করলি?

তীর দিয়ে ফল পাড়ার সুবিধা হবে না। তা হলে কী করা যায়? গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন ওপরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো।

ভাগ্নে বললো, মামা, এক কাজ করা যাক। তুমি আমার কাঁধের ওপর দাঁড়াও। তা হলে তুমি হাতে পেয়ে যাবে।

BanglaBook.org

মামা বললো, ওরে বাপরে, এই বুড়ো শরীর নিয়ে তা কি আমি পারবো?

ভাগ্নে বললো, তা হলে তোমার কাঁধে আমি উঠি?

মামা বললো, ওরে না না, তোর ভার আমি সইতে পারবো না। তার চেয়ে আমিই উঠছি বরং।

ভাগ্নে তখন হাঁটু গেড়ে বসলো, মামা তার দু'কাঁধে পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ব্যালান্স রাখবার জন্য মামা এক হাতে খামচে ধরলো ভাগ্নের মাথার চুল। তাতে চুলের মাঝখানের গর্তটাতেও হাত লেগে গেল।

ভাগ্নে বললো, উঁহুহু, ওখানে হাত দিও না। ওখানে হাত দিলে এখনো ব্যথা লাগে!

তারপর ভাগ্নে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। মামা এক হাতে গাছটা ধরে অন্য হাত বাড়িয়ে দিল ওপরের দিকে। তাতেও ঠিক হাত পাওয়া যায় না। মামা ডিঙি মেরে আর একটু উঁচু হবার চেষ্টা করতে তার আঙুলের ডগা ছুঁয়ে গেল একটা ফলকে! কিন্তু ধরা যায় না।

ভাগ্নে জিজ্ঞেস করলো, হয়েছে?

মামা বললো, আর একটু উঁচু।

ভাগ্নে আঙুলে ভর দিয়ে আর একটু উঁচু হলো! মামা তখন দু'হাত তুলে গাছের একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করলো কোনোক্রমে। ফলসুদ্ধ একটা ছোট ডাল ধরামাত্রই সেটা ভেঙে গেল মটাস করে, তাল সামলাতে না পেরে মামাও পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে।

ভাগ্নে চোখ কপালে তুলে দেখলো, একটা ফল দু'হাতে নিয়ে মামা পড়ে যাচ্ছে খাদের মধ্যে। ভাগ্নে হাত বাড়িয়েও কিছু করতে পারলো না।

সে খাদ যে কত গভীর তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। নিচের দিকটা মিশমিশে অন্ধকার। ভাগ্নে হায় হায় করে উঠলো!

ফল খাওয়া তো হবেই না, সে তার মামাকেও হারালো। মামা যতই বুড়ো হোক, তবু তো একজন কথা বলার সঙ্গী ছিল। এখন তাকে একা থাকতে হবে।

সে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠলো, মামা—।

অমনি খাদের বহু নিচ থেকে খুব অস্পষ্ট গলায় উত্তর এলো, আশু—।

ওরকম খাদে পড়ে গেলে কোনো মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পারে না। কিন্তু মামা বেঁচে আছে।

ভাগ্নে আবার চ্যাঁচালো, মামা, তুমি কোথায়?

BanglaBook.org

মামা সেই রকম বহুদূর থেকে উত্তর দিল, আমি এখানে। ওপরে ওঠার উপায় নেই, খাড়া পাহাড়!

ভাগ্নে বললো, আমিই বা নামবো কী করে?

মামা বললো, তুই নামতে পারবি না! বি-দা-য়! আ-র আ-মা-দে-র দে-খা হ-বে-না।

ভাগ্নে বললো, মামা, আমি যে কোনো উপায়ে হোক তোমায় উদ্ধার করবো। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই!

খিদে তেষ্টা ভুলে গিয়ে ভাগ্নে দৌড়াতে লাগলো উল্টো দিকে ফিরে। তার একটা কথা মনে পড়েছে। মামাকে উদ্ধার করার সেই একটা মাত্র উপায়ই আছে।

এখান থেকে তিনখানা পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। অত দূরে তারা বহু বছর যায়নি। মামাই বারণ করতো সব সময়। ওখানে বিপক্ষ দলের একজন থাকে। এখন বাধ্য হয়েই তার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হবে।

এক একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগলো ভাগ্নে। মাঝখানে একটা ঝর্নার জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিল। এক সময় মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন যেতে দেখে সে লুকিয়ে পড়লো ঝোপের মধ্যে। সে এরোপ্লেনের শব্দে ভয় পায় না বটে, কিন্তু তাকে কেউ দেখে ফেলুক, এটা সে চায় না।

শেষ পর্যন্ত তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে সে উপস্থিত হলো একটা উপত্যকায়। সেখানে একটা ঝর্নার পাশে গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট বাঁদর শুয়ে আছে।

ভাল করে দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, সেটি বাঁদর নয়, হনুমান। মুখটা কাল, চার পায়ের হাতের পাঞ্জাও কালো, লেজটি বেশ লম্বা।

হনুমানটি ঘুমিয়ে ছিল। ভাগ্নে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে কাতর গলায় ডাকলো, প্রভু! প্রভু!

দু তিনবার ডাকার পর হনুমানটি চোখ মেলে বললো, আঃ! কে রে বিরক্ত করে!

হনুমানটি সত্যিই মানুষের মতন কথা বলতে পারে। কারণ ইনি যে সে হনুমান নন, ইনি রামায়ণের সেই হনুমান। রামচন্দ্রের সেবক। এঁর তো মৃত্যু নেই, ইনি অমর, যতকাল পৃথিবী থাকবে ততকাল ইনিও বেঁচে থাকবেন। আগে এঁর শরীরটা ছিল ইলাস্টিক, ইচ্ছে মতন বড় কিংবা ছোট করা যেত। বহুকাল কেটে গেছে বলে এঁর শরীরের কলকব্জায় মরচে পড়েছে, এখন আর শরীরটা বড় হয় না।

BanglaBook.org

হনুমানের প্রশ্ন শুনে ভাগ্নে বললো, আজ্ঞে আমি দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।

হনুমান বললেন, আমায় এখানে জ্বালাতে এসেছো কেন?

—আজ্ঞে আমার বড় বিপদ।

—তোমার বিপদ তাতে আমি কী করব। যাও যাও।

—প্রভু, আমি বহু দূর থেকে এসেছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

—কী আপদ! এটা এখানে এত উৎকট শব্দ করে কেন? যা, যা।

—প্রভু, আমার মামা খাদে পড়ে গেছেন! তাকে আপনি বাঁচান! ইয়ে, মানে বাঁচাতে হবে না, উদ্ধার—।

—তোমার মামা খাদে পড়েছেন, বেশ করেছেন। আমি তাকে উদ্ধার করতে যাবো কেন? তোমার মামাটা কে?

আমার মামার নাম কৃপ। এক সময় ছিলেন মহাবীর। কৌরব পাণ্ডবদের পাঠশালায় অস্ত্র শিখিয়েছেন।

—হুঃ! ভারী তো মহাবীর! কোন্ যুদ্ধটা তিনি জিতেছেন শুনি? তাকে উদ্ধার করার কী দায় পড়েছে আমার?

—প্রভু, আমরা তো মোট সাতজন আছি। আমরা যদি পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য না করি, তা হলে কে করবে বলুন? এতদিন পরও শত্রুতা মনে রাখতে আছে?

—তা সাতজন যখন আছে, তখন অন্য কারুর কাছে যাও না। আমাকে বিরক্ত করছো কেন?

—আর কার কাছে যাব বলুন? আমাদের মধ্যে বলি আছেন পাতালে। আর ব্যাসদেব সকলের ঠাকুর্দা, অতি বুড়ো মানুষ, তাঁকে কি খাদে নামতে বলা যায়? তাছাড়া, শুনেছি তিনি থাকেন কাশীতে। বিভীষণ আছেন শ্রীলঙ্কায়। পরশুরাম দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তপস্যা করতে চলে গেছেন, এদিকে আর আসেন না। রইলাম বাকি আমরা তিনজন। এখন আপনি যদি সাহায্য না করেন—

—আমি এত বুড়ো হয়েছি, আমার গায়ে আর শক্তি নেই। নড়তে চড়তেই পারি না, আমি যাবো খাদে নামতে!

অশ্বত্থামা এবার রেগে গিয়ে ধনুকে বাণ জুড়ে বললো, তবে রে ব্যাটা হনুমান, এত করে বলছি, তবু তুই যাবি না? তাহলে তোকে মেরেই শেষ করবো।

হনুমান চোখ পিটপিট করে একটু দেখলেন অশ্বত্থামাকে। তারপর হঠাৎ তাঁর লেজটা দিয়ে অশ্বত্থামার গলায় তিন পাক জড়িয়ে তাকে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিলেন।

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে হনুমান বললেন, বুড়ো হয়েছি বলে কি গায়ে একটুও শক্তি নেই যে তোর মতন একটা চুনোপুঁটিকেও টিট করতে পারবো না?

লেজের পাকে বন্দী অবস্থায় অসহায় ভাবে অশ্বত্থামা হনুমানের স্তব করতে লাগলো। সে বললো, হে প্রভু, আপনাকে একটু উত্তেজিত করার জন্যই আমি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলাম। নইলে আপনাকে ভয় দেখাবো এমন সাধ্য কী আমার। আপনি মহা শক্তিমান, আপনি জন্মাবার পরই আকাশের সূর্যকে একটা ফল ভেবে এক লাফে ধরতে গিয়েছিলেন, আপনি এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন, আপনার মত মহাবীর আর কেউ নেই....।

প্রশংসা শুনে একটু খুশি হলেন হনুমান। তারপর অশ্বত্থামার গলায় তাঁর লেজের পাক একটু আলগা করে বললেন, হ্যাঁ, এক সময় ওসব করেছি বটে, কিন্তু এখন আর লাফ ঝাঁপ দিতে ভালো লাগে না। মরণ নেই, তাই কোনো রকমে বেঁচে আছি।

অশ্বত্থামা বললো, কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ পারবে না আমার মামাকে বাঁচাতে। আপনি লঙ্কা থেকে লাফিয়ে মন্দর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, আর হিমালয়ের একটা খাদ লাফানো তো আপনার কাছে নস্যি। ছোট্ট একটা লাফ দিলেই হবে।

হনুমান জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সে পড়েছে?

অশ্বত্থামা হাত তুলে তিনটে পাহাড় দূরে জায়গাটা দেখালেন। হনুমান বললেন, ওরে বাবা, অতদূর আমি হাঁটতেই পারবো না, হাঁটুতে দারুণ ব্যথা।

—আজ্ঞে, হাঁটতে হবে কেন? আপনি এক লাফেই তো পৌঁছে যেতে পারেন।

বুড়ো বয়সে যখন-তখন কেউ তিড়িং তিড়িং করে লাফায়? একবার লাফালে সেই ঢের। আমি যদি বা লাফিয়ে যাই, তুই যাবি কী করে?

—আপনি যদি আমায় পিঠে করে নিয়ে যান।

—লজ্জা করল না ঐ কথাটা বলতে? আমি বুড়ো মানুষ, তোর মতন একটা জোয়ানকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবো? তুই যদি আমায় ঘাড়ে করে নিয়ে যাস, তাহলে যেতে পারি।

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হলো, হনুমান কিছুতেই হেঁটে বা লাফিয়ে যেতে রাজি নয়। অশ্বত্থামা তাকে কাঁধে করে সেই তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পরদিন সকালে পৌঁছালো খাদটার কাছে।

অমররা কিছুতেই মরবে না, বেঁচে আছে ঠিকই, তবু জ্ঞান আছে কিনা জানবার জন্য অশ্বত্থামা ডাকলো, মামা—

BanglaBook.org

খাদের তলা থেকে উত্তর এলো, আশু, আমায় এখান থেকে তোল, এখানে বড্ড পিঁপড়ে—

অশ্বত্থামা বললো, মামা, ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে গেছে, হনুমানজী এসেছেন।

হনুমান ততক্ষণ দেখলেন গাছটাকে। বয়সের জন্য চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে, সব জিনিস ভাল দেখতে পান না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা মৃতসঞ্জীবনী গাছ না?

অশ্বত্থামা বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গাছটার ফল পাড়তে গিয়েই তো।

হনুমান অমনি একলাফে গাছটায় উঠতে গেলেন।

কিন্তু কী কাণ্ড, হনুমান মোটে গাছটার আধখানা উঁচু পর্যন্ত উঠতে পারলেন, তারপরই পড়ে যাচ্ছিলেন।

হনুমান বললেন, ইস্, দেখলি কী অবস্থা হয়েছে আমার। এইটুকুও লাফাতে পারি না। খাদ থেকে তোর মামাকে তুলবো কী করে?

অশ্বত্থামা নিরাশ হয়ে বললো, তাহলে কি হবে?

—দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।

হনুমান গাছটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আর আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন গাছটা বেয়ে। নিজের জাতের এই পুরনো অভ্যেসটা তিনি এখনো ভোলেননি। ক্রমে একেবারে উঠে গেলেন গাছের ডগায়। একটা ফল ছিঁড়ে কামড়েই তিনি বললেন, আঃ, কী অপূর্ব স্বাদ! অশ্বত্থামা লোভীর মতন বললো, প্রভু, আমায় একটা দিন। আপনি ছুঁড়ে দিন, আমি লুফে নেব।

হনুমান এক ধমক দিয়ে বললেন, দাঁড়া বাপু! আমি আগে পেট ভরে খেয়ে নিই। এক হাজার বচ্ছর কিছু খাইনি, শুধু রাম নাম জপ করে খিদে মিটিয়েছি।

এক এক করে সে গাছের সব কটা ফলই খেয়ে ফেললেন তিনি। অমনি তাঁর শরীরটাও বড় হতে লাগল মৃতসঞ্জীবনী ফলের গুণে। তিনি বিশাল হয়ে গেলেন এবং এমন গর্জন করে উঠলেন যে সমস্ত বন কেঁপে উঠল।

তারপর লাফিয়ে নিচে নেমে এসে অশ্বত্থামাকে নিজের এক বগলের মধ্যে চেপে ধরলেন।

অশ্বত্থামা বললো, এ কী, এ কী। আপনি আমায় একটাও ফল দিলেন না?

হনুমান বললেন, চল।

তারপর অশ্বত্থামাকে বগলে চেপে রেখেই তিনি এক লাফে চলে এলেন খাদের তলায়।

BanglaBook.org

সেখানটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। শব্দ শুনে কৃপ বললেন, ওরে আশু, এসেছিস? হনুমানকে পাওয়া গেছে, আর চিন্তা নেই। ঐ গাছের ফলগুলো যে কী সুন্দর, কী মিষ্টি, তোকে কী বলবো। একটা ফল খেয়েই আমার গায়ে যেন অনেক জোর বেড়ে গেছে। হনুমান আমাদের ফলগুলো পেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই দেবে, তাই না হনুমান?

হনুমানের বগলের চাপে অশ্বত্থামার দম প্রায় আটকে আসার মতন অবস্থা। সে চিঁচিঁ করে বললো, মামা, উনি সব ফলগুলো খেয়ে ফেলেছেন। চি-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

হনুমান বললেন, কী আপদ, এটা ঘোড়ার মতন ডাকে কেন? এটা মানুষ না ঘোড়া?

কৃপ বললেন, আপনি জানেন না, জন্মাবার সময়ই ও ঘোড়ার মতন ডেকে উঠেছিল বলেই তো ওর নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়েছিল। অনেকদিন এ রকম ডাকেনি, আবার শুরু করেছে। ও হনুমান, তুমি ফলগুলো সব খেয়ে ফেলেছো, অ্যাঁ?

হনুমান বললেন, বেশ করেছি।

অশ্বত্থামা বললো, ও হনুমানজী প্রভু, ছেড়ে দিন, আমার লাগছে, চি-হিঁ-হিঁ-হিঁ।

হনুমান প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে বললেন, চোপ!

তারপরেই তিনি কৃপকে উদ্দেশ্য করে পেল্লায় এক চড় কষালেন।

কৃপ বললেন, এ কী!

হনুমান বললেন, এখন আমার সব মনে পড়ে গেছে। ভীম আমার সম্পর্কে ভাই হয়। সেই হিসেবে সব পাণ্ডবরাই আমার ভাই। তোমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। শুধু তাই নয়, পাঁচটা কচি কচি ছেলে তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তাদের গলা টিপে মেরে ফেলেছিল এই পাষণ্ড অশ্বত্থামা। আর তুমি কৃপ, তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলে। আমার ভাইপোদের তোমরা মেরেছিলে, আজ আমিও তোমাদের গলা টিপে মেরে ফেলবো।

কৃপ বললেন, ওসব পুরনো কথা আর এখন কেন মনে করছো ভাই? যা হবার তা তো হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। তাছাড়া আমাদের কী মরণ আছে যে তুমি মারবে?

হনুমান বললেন, তাহলে তুমি এই খাদের মধ্যে অন্ধকারে নরকে থাকো। আমি এর অন্য ব্যবস্থা করছি।

কৃপ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, ও হনুমান ভাই, আমাকে এখানে ফেলে যেও না। এখানে ভীষণ পিঁপড়ে, আমায় সর্বক্ষণ কামড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

—নরকেও এরকম পিঁপড়ে থাকে।

এই বলেই হনুমান 'হুপ' শব্দ করে এক লাফে উঠে এলেন খাদের ওপরে। তারপর সেখান থেকে আর এক লাফে চলে এলেন কাশ্মীরে। সেখানে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার একটা চূড়ায় এসে নেমে হনুমান অশ্বত্থামাকে বগল থেকে মুক্ত করলেন।

অশ্বত্থামা বললেন, এ কোথায় এলাম, চি-হিঁ—

হনুমান বললেন, তোকে খুব ভালো জায়গায় এনেছি।

আঙুল দিয়ে অনেক নিচের একটা উপত্যকা দেখিয়ে বললেন, ওখানে কী ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছিস?

অশ্বত্থামা বললো, ঘোড়া মনে হচ্ছে।

হনুমান বললেন, হ্যাঁ, ওখানে একজাতের খুব ভালো ঘোড়া থাকে। কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত ওদের ধরতে পারেনি, কারণ ওখানে কেউ নামতে পারে না। আর যদি বা নামে, উঠতে পারে না। শিশু হত্যাকারী পশু, তুই চিরকাল ঐ ঘোড়াদের সঙ্গে থাকবি। ভীম তোর মাথার চুল কেটে মণি কেড়ে নিয়েছিল, তাতেও তোর শাস্তি হয়নি। আমি তোকে এই শাস্তি দিলাম।

অশ্বত্থামা বাধা দেবার আগেই হনুমান তার ঘাড় ধরে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলেন যে সে ছিটকে পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে একেবারে সেই অনেক নিচের উপত্যকায় গিয়ে পড়লো। ওখান থেকে আর উঠতে পারবে না কোনোদিন।

সন্তুষ্ট মনে হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফ দিয়ে আবার ফিরে এলেন হিমালয়ে, সেই ঝর্নার ধারে, তাঁর নিজের জায়গায়!

BanglaBook.org

জলচুরি

বিকেল থেকেই আমি আর প্রদীপ বসে রইলুম নদীর ধারে। আমাদের সঙ্গে একটা ঝোলায় রয়েছে অনেক স্যান্ডউইচ, কমলালেবু। আর ফ্লাস্ক ভর্তি চা। হয়তো আমাদের সারা রাত জাগতে হবে।

গ্রীষ্মকাল। নদীর ধারে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগবারই কথা। বিরাট চওড়া নদী, নামটিও চমৎকার। এই নদীর নাম ডায়না। শীতকালে এই ডায়না নদী প্রায় শুকিয়ে যায়, হেঁটেই ওপারে যাওয়া যায়। অনেক ট্রাক এই নদীর বুকে বেয়ে আসে পাথর আর বালি নিয়ে যাবার জন্য।

কিন্তু বৃষ্টি নামলেই এই নদীর চেহারা বদলাতে শুরু করে। পাহাড়ী নদী, যখন ঢল নামে, তখন স্রোত হয় সাঙ্ঘাতিক। জল যেন একেবারে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

এখন ডায়না নদীর সেই রকম অবস্থা।

প্রদীপ বলল, দ্যাখ সুনীল, রাত্তিরে হয়তো সেই ব্যাপারটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। হয়তো সারা রাত জেগে থাকা এমনি এমনিই হবে। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবি না।

আমি বললুম, দেখাই যাক না।

প্রদীপ তবু বলল, তুই ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়ে নিতেও পারিস। যদি সত্যি সেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। আমি তোকে ডেকে তুলব।

আমি বললুম, একটা রাত জেগে থাকতে আমার কষ্ট হয় না।

সন্ধের পর থেকে চারিদিক একেবারে নিঝুম হয়ে এল। এত নিস্তব্ধতা যে গাছ থেকে একটা শুকনো পাতা খসে পড়লেও সে শব্দ শোনা যায়।

প্রদীপ ওর রাইফেলটা ঠিকঠাক করে পাশে রাখল।

আমরা যা দেখতে এসেছি, তার জন্য অবশ্য রাইফেল দরকার হয় না। কিন্তু এদিকে চোর ডাকাতের ভয় আছে। সেই জন্যেই একটা কিছু অস্ত্র রাখা হয়েছে সঙ্গে।

আর একটা উপদ্রবের কথাও শোনা যাচ্ছে কয়েকদিন ধরে। একটা হাতি নাকি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকদিন ধরে। হাসিমারার কাছে সেই পাগলা হাতিটা নাকি মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা যাত্রী বোঝাই বাস উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিল।

BanglaBook.org

উত্তরবঙ্গে হাতির উপদ্রব লেগেই থাকে। এদিকের জঙ্গলে হাতিও আছে। কিন্তু এখানকার বাঘেরা সেরকম কোনো ঝামেলা করে না। নিজেদের মনে জঙ্গলেই থাকে। হাতিরাই হামলা করে বেশি। দল বেঁধে হাতিরা যখন রাস্তা পার হয়, তখন দু'দিকের গাড়ি ঘোড়া সব থেমে যায়। চা বাগানেও হাতিরা ঢুকে পড়ে ঘর বাড়ি ভেঙে দেয়। তাদের সামনে কোনো মানুষজন পড়লে চেপ্টে মেরে ফেলে। হাতিরা হাজার হাজার বছর ধরে একই রাস্তায় চলে। তাদের চলার পথে কেউ ঘরবাড়ি বানালে তারা সহ্য করতে পারে না, ভেঙে দেবেই।

আর কোনো হাতি যদি হঠাৎ পাগল হয়ে যায় তা হলে তো আর কথাই নেই।

আমরা যেখানে বসে আছি, তার পেছনেই জঙ্গল। এ জঙ্গল অবশ্য খুব ঘন নয়। পাতলা পাতলা, এখানে বাঘ কিংবা হাতি থাকে না। কিন্তু পাগলা হাতির কথা তো বলা যায় না।

সেইজন্যই আমরা বারবার পেছনে তাকাচ্ছি। প্রদীপ অবশ্য খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে পাগলা হাতিটাকে গতকাল দেখা গেছে পঞ্চাশ মাইল দূরে। সুতরাং আজ এখানে দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য হাতিরা ইচ্ছে করলে একদিনে অনায়াসে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে আসতে পারে। যদিও হাতিদের সেরকম ইচ্ছে কদাচিৎ হয়।

এখান থেকে বারো মাইল দূরে একটা চা বাগানের ম্যানেজার হলেন প্রদীপের বাবা। প্রদীপের ছেলেবেলা কেটেছে এই অঞ্চলেই। তারপর ও কলকাতার কলেজে পড়তে গেছে। প্রত্যেক ছুটিতেই প্রদীপ এই চা বাগানে আসে। এবারে ওর সঙ্গে আমি এসেছি।

কথায় কথায় প্রদীপ একদিন বলেছিল ডায়না নদীর এক অদ্ভুত ঘটনার কথা। আমি শুনে বিশ্বাস করিনি। উত্তরবঙ্গ তো কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। ওখানকার ডায়না নদীতে এরকম একটা ব্যাপার হলে নিশ্চয়ই খবরের কাগজে-টাগজে ছাপা হত।

প্রদীপ রেগে গিয়ে বলেছিল, কোনো কাগজের লোক ঐ নদীর ধারে সারা রাত জেগে থাকতে পারবে? না হলে দেখবে কি করে?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুই কি নিজের চোখে দেখেছিস? না অন্য কারুর কাছে শুনেছিস?

প্রদীপ বলেছিল, আমি নিজের চোখে সবটা দেখিনি বটে, তবে এর আওয়াজ আমি নিজের কানে শুনেছি. আর আমি অন্তত পাঁচজন অতি বিশ্বাসী লোককে জানি, যারা নিজের চোখে সবটা দেখেছে।

BanglaBook.org

আমি বলেছিলুম, আমি নিজের চোখে না দেখলে এসব কিছুতেই মানতে পারব না। সে যত বিশ্বাসী লোকই বলুক।

সেই জন্যই পরশুদিন এই চা বাগানে পৌঁছবার পর থেকেই আয়োজন হচ্ছিল এই নদীর ধারে এক রাত কাটাবার। প্রদীপ অবশ্য বারবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছে প্রত্যেক রাত্রে যে এরকম ঘটবেই, সে রকম কোনো কথা নেই। আমাদের লাক ট্রাই করতে হবে।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর অল্প অল্প জ্যোৎস্না। আমি টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখলুম। মোটে সওয়া নটা বাজে, এখনো অনেক রাত বাকি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা প্রদীপ, তুই আওয়াজটা শুনেছিস, সেটা ঠিক কি রকম?

প্রদীপ বলল, অবিকল কামানের গর্জনের মতন। ঠিক আধ মিনিট কি এক মিনিট অন্তর অন্তর বুম্ বুম্ শব্দ। দশ বার থেকে বারো বার। এ আওয়াজ আমার বাবা শুনেছেন, চা বাগানের অনেকেই শুনেছেন।

—তুই কি ছেলেবেলা থেকেই এ রকম আওয়াজ শুনছিস?

—না, না, আগে কিছু না। এটা তো শুরু হয়েছে শুধু গত বছর থেকে। আগে ডায়নার ধারে প্রায়ই হরিণ দেখতে পাওয়া যেত। আমরা ছেলেবেলায় কতবার এখানে শিকার করতে এসেছি। আজকাল শুনছি ডায়নার তীরে-এদিকটায় শব্দের পরে ভয়ে কেউ আসে না।

—আওয়াজের পরে কি হয়?

—জল তোলপাড় হতে থাকে। ঠিক সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন। না, না, এটা ঠিক হল না। আমাদের বাগানের সর্দার শিবু সোরেন দেখেছে। সে বলেছিল, ঠিক যেন একটা বিরাট প্রাণী মাথা তোলার চেষ্টা করছে।

—হাতি-টাতি নয় তো? হয়তো পাহাড় থেকে কোনো হাতি ধেয়ে এসেছিল।

—ডায়নার জলে হাতি নামবে? তুই একটুখানি চেয়ে দ্যাখ না কী দারুণ স্রোত! দশটা হাতিকেও এক সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারপর কী হয় যেন। কিছুক্ষণ জল ওই রকম তোলপাড় হবার পর অনেকখানি জল গোল হয়ে লাফিয়ে ওঠে ওপরে। সেইরকমভাবে উঠতেই থাকে। কলকাতার মনুমেন্টের মতন উঁচু হয়ে যায়।

—এই জায়গাটাই আমার গাঁজাখুরি লাগে। জল কখনো অত উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে? মাধ্যাকর্ষণকে জয় করবে কি করে?

BanglaBook.org

—তুই বুঝি জলস্তম্ভের কথা শুনিসনি?

—তা শুনব না কেন? কিন্তু জলস্তম্ভ মোটেই অত উঁচু হয় না। দু'দিকের বিপরীত স্রোতে ধাক্কা লেগে জল অনেক সময় খানিকটা উঁচুতে উঠে যায়। বড় জোর এক মানুষ, তারপর ঘুরতে ঘুরতে আবার নিচে পড়ে। পুরোটাই ফোর্সের ব্যাপার। আমার মনে হয় সে রকম কোনো জলস্তম্ভকেই এখানে এরা মনুমেন্টের আসন দিয়েছে। আমাদের দেশে লোকেরা সব কিছুই বড্ড বাড়িয়ে বলে।

আর ওই কামানের মতো আওয়াজ কেন হয়? এ সম্পর্কে তোর কি ধারণা?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার বাবার মুখে 'বরিশাল গান' বলে একটা ব্যাপার শুনেছি। বরিশাল শহরের পাশে যে নদী আছে, কী নদী নাম মনে নেই। সেই নদীতেও নাকি ওরা মাঝে মাঝে এই রকম গুম গুম শব্দ শুনেছেন। ঠিক কামানের মতনই। তাই সেই আওয়াজের নাম 'বরিশাল গান'। সাহেবদের ধারণা ছিল, সেই নদীর গর্তে কোথাও একটা বিরাট গর্ত আছে। সেই গর্তে জল ঢুকবার সময় ওই আওয়াজ হয়। এই ডায়না নদীতেও নিশ্চয়ই সেরকম কোনো গর্ত-টর্ত আছে।

—আমি শীতকালে এই ডায়না নদী অনেকবার হেঁটে পার হয়েছি, কোনো গর্ত দেখিনি। সে রকম গর্ত থাকলে এখানকার সবাই জানত।

—আরে সে কি আর সাধারণ গর্ত হবে? সাধারণ গর্ত হলে সে গর্ত আগেই ভরে যাবে জলে। নিশ্চয়ই সে গর্ত পাথর-টাথরের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। কখনো সেই পাথর সরে গেলেই সেখানে হুড়হুড় করে জল ঢোকে।

—তুই খুব সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে দিলি তো।

—দ্যাখ না আজ যদি ওই ব্যাপারটা হয়, আমি ঠিক প্রমাণ করে দেব যে ওটা খুবই সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। মনুমেন্টের মতন জলস্তম্ভ না হাতি। উঁঃ। যত সব গাঁজা।

একটু আগেই আমরা স্যান্ডউইচ ও কমলালেবু খেয়ে নিয়েছি। তবু আবার খিদে পাচ্ছে। কিছু করার না থাকলেই শুধু খেতে ইচ্ছ করে।

ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা খেলুম। আকাশে জ্যোৎস্না কমে আসছে, ঘন হয়ে জমাট বাঁধছে মেঘ। বৃষ্টি নামলেই মুশকিল। আমরা বসে আছি খোলা জায়গায়, হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামলে আশ্রয় নেবার মতন কোনো জায়গাও নেই।

এক সময় আমাদের পেছনের জঙ্গলে খচর-মচর শব্দ হতেই আমরা চমকে উঠলুম। প্রদীপ বন্দুকটা তুলে নিল।

BanglaBook.org

শব্দটা একবার হয়েই থেমে গেল। প্রদীপ ফিসফিস করে আমাকে বলল, ভয় নেই, খুব সম্ভবত শেয়াল। কিংবা হরিণও হতে পারে।

আমরা কান খাড়া করে রইলুম, যদি আর কোনো শব্দ শোনা যায়। এইরকম সময় এক একটা মুহূর্তকে মনে হয় অনেক সময়। তবু আমরা বেশ কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকলুম, কিছু শোনা গেল না।

তারপরেই বৃষ্টি নামল। প্রদীপ বলল, আজকের মতন অ্যাডভেঞ্চার শেষ। যা মেঘ করেছে, এখানে আর থাকা যাবে না।

আমি ব্যাগে জিনিসপত্রগুলো ভরে নিতে লাগলুম। প্রদীপ পাট করতে লাগল সতরঞ্চিটা। একটু দূরে রাস্তার ওপরে আমাদের জিপ গাড়িটা রাখা আছে, সেখানেই ফিরে যেতে হবে।

সেই সময় ধুম করে এমন জোরে শব্দ হল যে আমরা দু'জনেই কেঁপে উঠলুম। শব্দটা এসেছে নদীর বুক থেকে। কামানের গর্জনের মতনই বটে।

সেই শব্দটা হওয়ামাত্র বনের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য পড়ে গেল। কী যেন একটা বড় জানোয়ার ভয় পেয়ে ছুটে গেল হুড়মুড় করে। তারপরই আবার একবার ওই শব্দ। যেন কানে তালা লেগে যায়। প্রদীপ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এবার বিশ্বাস হল তো?

আমি এমনই হতচকিত হয়ে গেছি যে কোনো কথাই বলতে পারলুম না। কোনো গর্তে জল ঢোকার জন্য তো এত জোরে শব্দ হতে পারে না।

আকাশে আলো এত কম যে নদীর বুকটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু শব্দটা যেন একই জায়গা থেকে উঠছে মনে হয়। যেন ঠিক আধ মিনিট সময় নিয়ে একটা বিরাট কামান দাগা হচ্ছে। ঠিক এগারোবার শুনলুম সেই শব্দ। তারপর নদীতে জল তোলপাড় হতে লাগল। সেটা আমরা চোখে ঠিক দেখতে পেলুম তা নয়। কিন্তু জলের মধ্যে যে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটছে তা আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়। প্রদীপ বলল, ওই দ্যাখ, সুনীল ওই দ্যাখ। আবছা অন্ধকারেও বেশ দেখা গেল, যে নদী থেকে ঠিক একটা মোটা গাছের গুঁড়ির মতন জল উঠে আসছে ওপরের দিকে। ক্রমশ তা উঁচু হতে লাগল। শুধু আমাদের কলকাতার মনুমেন্ট কেন, দিল্লির কুতুবমিনারের চেয়েও উঁচুতে উঠতে লাগল ওই জল। ওপরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সেই জল যেন আকাশ ছুঁতে চলেছে।

BanglaBook.org

আমি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কখনো হতে পারে? মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ব্যর্থ করে দিচ্ছে জল? চাঁদের টানে আমাদের পৃথিবীর জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সেইজন্য নদীতে বান হয়। জোয়ার-ভাটা হয়। কিন্তু সে আর কতটুকু?

প্রদীপ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি আর দেখতে পারছি না। চল, এখান থেকেই পালাই!

অজানা একটা ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। যুক্তি দিয়ে যা মানতে পারি না, তা নিজের চোখে দেখলে তো ভয় হবেই।

আর একবার তাকিয়ে দেখলুম, সেই জলের স্তম্ভ যেন সত্যিই আকাশে পৌঁছে গেছে।

প্রদীপ আমার হাত ধরে টেনে দৌড় লাগাল। আমরা জিপ গাড়িটার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলুম। এখান থেকেও সেই জলস্তম্ভটা দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলুম। জলস্তম্ভটা এক সময় শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু সেটা আর নিচে পড়ল না, মিলিয়ে গেল আকাশে।

এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। আকাশ থেকে কেউ এসে আমাদের নদীর জল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কে?

BanglaBook.org

ইংরিজির স্যার

পুজোর ছুটি হবার মাত্র তিনদিন আগে অরূপ ক্লাসে এসে বলল, জানিস, রামগোপাল স্যার স্কুল ছেড়ে দিচ্ছেন।

আমরা সবাই একসঙ্গে অবাক হলুম।

রবীন বলল, যাঃ, কি বাজে কথা বলছিস।

আমি বললুম, হতেই পারে না।

রমেন বলল, এক-একদিন এই অরূপটা এক-একটা নতুন গুল্ ছাড়ে।

অরূপ গম্ভীরভাবে বলল, আমি না জেনে কোনো কথা বলি না। রামগোপাল স্যার কালও স্কুলে আসেননি, আজও আসবেন না।

আমি বললুম, তা হলে নিশ্চয়ই ওঁর জ্বর হয়েছে।

পেছন থেকে শান্তনু বলল, আমি কিন্তু স্যারকে আজ সকালে কেষ্টদার চায়ের দোকান থেকে বেরুতে দেখেছি।

অরূপ বলল, দেখলি?

ঘণ্টা বেজে গেছে, এখানো স্যার আসেননি। প্রথম পিরিয়ডেই অঙ্ক। ভবানীবাবু স্যার একটু দেরিতেই আসেন।

রামগোপাল স্যার আর আসবেন না। এ কথাটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এই নিয়ে একটা গুঞ্জন চলতে লাগল।

আমাদের যে-কজন টিচার আছেন, তাঁদের মধ্যে রামগোপাল স্যারই সবচেয়ে কড়া। তাঁর ক্লাসে একটাও কথা বলা চলবে না। কেউ বাইরে যেতে পারবে না।

ক্লাসে ঢুকেই রামগোপাল স্যার দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ধপধপে সাদা প্যান্ট ও সাদা ফুলশার্ট পরে থাকেন রোজ। কোনোদিন তাঁকে সামান্য একটু ময়লা পোশাক পরে স্কুলে আসতে দেখিনি। মাথায় কুচকুচে কালো চুল একেবারে নিখুঁতভাবে আঁচড়ান। চোখে আরশোলা রঙের ফ্রেমের চশমা। চৌকো ধরনের মুখ। উনি প্রায়ই ওঁর থুতনিতে একটা আঙুল ঠেকিয়ে থাকেন।

উনি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেই সমস্ত ক্লাস একেবারে চুপ হয়ে যায়। উনি তখন গম্ভীরভাবে হেঁটে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে টেবিলের সামনে দাঁড়ান। তাকিয়ে দেখেন সারা ক্লাসের দিকে । তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, আর ইউ রেডি ফর মি?

এই কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে ।

BanglaBook.org

বছরের শুরুতেই রামগোপাল স্যার আমাদের বলে দিয়েছিলেন, যাদের পড়তে ইচ্ছে করে না কিংবা ক্লাস সব শুনতে চায় না, তারা ইচ্ছে করলে বাইরে চলে যেতে পারে। সেজন্য কারুকে তিনি শাস্তি দেবেন না। কারুর যদি ঘনঘন জল তেষ্টা পায় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়, তাহলেও তারা আগেই বেরিয়ে যেতে পারে। মাঝখানে আর ফিরে আসতে পারবে না। তাঁর ক্লাস চলার সময় কারুর বেরুনো নিষেধ।

রামগোপাল স্যার আমাদের পড়ান ইংরিজি। অন্য সময় গম্ভীর থাকলেও পড়াবার সময় তিনি নানারকম মজার কথা বলেন, অনেক গল্পও বলেন। কিন্তু কেউ একটু শব্দ করলেই তিনি গর্জন করে ওঠেন, সাইলেন্স! আই ওয়ান্ট পিন ড্রপ সাইলেন্স!

এত কড়া হলেও রামগোপাল স্যারের ক্লাসই আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে। অরূপ বার বার বলতে লাগল, সে পাকা খবর এনেছে যে, রামগোপাল স্যার আর আসবেন না। তবে কোথা থেকে যে ও খবরটা জেনেছে, তা ও কিছুতেই বলবে না।

ভবানীবাবু স্যার এসে পড়তেই আমরা যে-যার সিটে গিয়ে বসে পড়লুম।

উনি প্রথমে রোল কল্ করেন। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে শুরু করে দেন পিছন ফিরে। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে কিছু বলেন না।

পরের ক্লাস বাংলা। আমাদের বাংলা স্যারের বয়েস বেশ কম, আর অনেকটা ভাল মানুষ ধরনের। ওঁর সঙ্গে আমাদের অনেক রকম গল্প হয়।

বাংলার স্যার পঙ্কজবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটা পড়াচ্ছেন, হঠাৎ রবীন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার, একটা কথা বলব?

পঙ্কজবাবু বই থেকে চোখ তুলে বললেন, বল।

স্যার, আমাদের রামগোপাল স্যার কি স্কুল থেকে চলে যাচ্ছেন?

পঙ্কজবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তা তো আমি জানি না। এ রকম কোনও কথা তো আমি শুনিনি। হ্যাঁ তারপর শোন, ফটিক যখন বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি, অমন বাড়ি বলতে কোন্ বাড়ি বোঝাচ্ছে?

পঙ্কজবাবু চলে যেতেই আমরা সবাই আবার ঘিরে ধরলুম অরূপকে। বললুম, গুল্‌বাজ! এবার তো ধরা পড়ে গেলি? ইংরিজি স্যার চলে গেলে বাংলা স্যার তা জানতেন না?

অরূপ তবু গোঁয়ারের মতন বলল, দেখিস সব সঠিক সময় জানতে পারবি। অত যদি তোদের সন্দেহ থাকে, তা হলে এবারে হেড স্যারকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ্ না।

এই ক্লাসটা নিতে এলেন হেড স্যার। তিনি পড়ান ইতিহাস। তিনি শুধু সাল, তারিখের কচকচি শোনান, কোনো গল্প বলেন না বলে ইতিহাসের ক্লাস শুনতে আমার

BanglaBook.org

ভাল লাগে না। তবে হেড স্যারকে সবাই ভয় পায়। হেড স্যার রেগে গেলেই বাড়িতে চিঠি যাবে।

হেড স্যারকে কে জিজ্ঞেস করবে ওই কথাটা? সবাই ভয় পাচ্ছে। আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে চোখাচোখি করছি। কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছি না।

ক্লাসের একেবারে শেষদিকে অরূপ নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আমাদের ইংরিজির টিচার রামগোপাল স্যার চলে যাচ্ছেন বুঝি?

হেডমাস্টার মশাই স্থিরভাবে তাকালেন অরূপের দিকে। মনে হল রেগে গেছেন। তারপর বললেন, দ্যাট ইজ নান্ অফ ইয়োর বিজনেস্।

হেড স্যার চলে যাবার পর অরূপ বলল, দেখলি, হেড স্যার স্বীকার করলেন কিনা?

কিন্তু হেড স্যারের ওই কথাটাতে যে ঠিক কি বোঝায়, তা আমরা বুঝলুম না। উনি হ্যাঁ-ও বলেননি, না-ও বলেননি।

কিন্তু রামগোপাল স্যার চলে যাবেন কেন?

পরদিনও রামগোপাল স্যার এলেন না। অরূপ ছাড়া আজও তিন চারজন বলল, তারাও শুনেছে রামগোপাল স্যার সত্যিই আর থাকছেন না এই স্কুলে। আর তিনি আসবেন না কোনোদিন।

আজ আমার মনে হল, এরা বোধহয় সত্যি খবরই বলছে। আমার বুকটা কাঁপতে লাগল। নিজেকে মনে হল, দারুণ একটা অপরাধী।

আমি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলুম, স্যার কেন চলে যাচ্ছেন রে?

একজন বলল, হেডুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। হেড মাস্টারমশাই ওকে দেখতে পারতেন না, জানিস না?

আর একজন বলল, উনি বিলেত চলে যাচ্ছেন।

আর একজন বলল, বিলেত না, বিলেত না। উনি একটা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভাল চাকরি পেয়েছেন।

এর কোনোটাই আমার সত্যি মনে হল না।

আমরা মনে হল আমিই এর জন্য দায়ী। আমার ব্যবহারে রাগ করে স্যার আর এ স্কুলেই আসবেন না ঠিক করেছেন।

আমি স্যারের নীল রঙের কলমটা নিয়ে নিয়েছি। তা বলে কলমটা চুরি করিনি আমি। আমার তিন চারটে ডট্ পেন আছে, তবু শুধুশুধু আমি ওই রকম একটা কলম চুরি করতে যাব কেন?

BanglaBook.org

সাতদিন আগে হোম ওয়ার্ক দেখাচ্ছিলুম রামগোপাল স্যারকে। টেবিলের ওপর ওঁর কলমটা খোলা ছিল। আমিও বাড়িয়ে দিয়েছিলুম আমারটা। তারপর এক সময় বদলাবদলি হয়ে গেল।

দুটো কলম ঠিক একই রকম দেখতে। দামও বোধহয় এক। তবে ওঁর কলমটার গায়ে লেখা আছে আর. জি.। নিশ্চয়ই রামগোপাল স্যার নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এটা ওঁর শখের কলম।

ভুলটা ধরা পড়ে রাত্তিরবেলা আমার পড়ার টেবিলে। তখন আমি ঠিক করেছিলুম, পরেই দিনই স্যারের কলমটা ফেরত দিয়ে আমারটা বদলে নেব। তারপর ভাবলুম, সেদিনের হোম ওয়ার্কটা স্যারের কলম দিয়েই লেখা যাক না।

আশ্চর্য ব্যাপার, ইংরিজি হোম ওয়ার্ক করতে গিয়ে রোজই আমার মাথা গুলিয়ে যায়। ঠিক ঠিক শব্দটা মনে আসে না। কিন্তু সেদিন স্যারের কলম দিয়ে লিখতে গিয়ে লিখে ফেললুম তর্‌তর্‌ করে। পরের দিন আমার লেখায় একটাও ভুল বেরুল না।

তখন আমি ভাবলুম, এটা কি কলমের গুণ, না আমার গুণ?

আর একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেদিন আর ফেরত দিলুম না কলমটা। সেদিনও বাড়িতে গিয়ে সব লেখা লিখলুম সেই কলমটা দিয়ে। শুধু ইংরিজি নয়, অন্য সাবজেক্টও অনেক সোজা লাগল। পরের দিন আবার সব কটা খাতাতেই ফুল মার্কস পেলুম।

সেইজন্য আর ফেরত দেওয়া হয়নি কলমটা। স্যারের এই কলমে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে। এই কলম থাকলে আমি ফার্স্ট হয়েও যেতে পারি।

স্যার নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝে গেছেন যে তাঁর কলমটা অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে। কে নিয়েছে তা বুঝতে পারেননি নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর ছাত্ররা নিজের থেকে কলমটা ফেরত দেয়নি বলে মনে দুঃখ পেয়েছেন, সেইজন্য আর স্কুলে আসছেন না।

সারা বিকেল আমার মন খারাপ হয়ে রইল। খেলতে যেতে ইচ্ছে করল না। সন্ধেবেলা পড়ায় মন বসল না। রামগোপাল স্যারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলুম।

স্যারের বাড়ি দূর থেকেই দেখেছি, কোনোদিন ভেতরে ঢুকিনি। জানি, স্যার দোতলায় থাকেন। দোতলায় সব ঘরে আলো জ্বলছে।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। স্যার নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন, আমায় দেখে যদি আরও রেগে যান? আমি কখনো কোনও মাস্টার মশাইয়ের কাছে বকুনি খাইনি।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত উঠে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে।

স্যারের বসবার ঘরে অনেক লোক। স্যারের বন্ধু নিশ্চয়ই সবাই। স্যার পরে আছেন একটা পায়জামা আর গেঞ্জি। সাদা প্যান্ট শার্ট ছাড়া স্যারকে আমি কখনও দেখিনি। তাই স্যারকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

একবার ভাবলুম, কলমটা দরজার কাছে রেখে চলে যাই। কিন্তু তার আগেই স্যার আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

তিনি উঠে এলেন দরজার কাছে। আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম দেওয়াল ঘেঁষে। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে।

আমায় দেখে চিনতে পারলেন স্যার। তিনি বললেন, আরে, তুমি বরুণ মৌলিক না, ক্লাস এইটের? কী ব্যাপার? এস, এস, ভেতরে এস।

আমি সেখান থেকে নড়তেও পারলুম না। আমার গলা থেকে কথাও বেরুল না।

আমার কাঁধে হাত রেখে স্যার বললেন, কী হয়েছে, বরুণ? আমায় কিছু বলবে?

আমি পকেট থেকে কলমটা বার করে দিয়ে বললুম, স্যার, আপনার এই কলমটা আমার কাছে ছিল, ফেরত দেওয়া হয়নি।

স্যার অবাক হয়ে বললেন, আমার কলম! কিন্তু আমার তো কোনও কলম হারায়নি।

—এটা আমার সঙ্গে বদলা-বদলি হয়ে গিয়েছিল।

—ও তাই নাকি? তার মানে তোমারটা আমার কাছে? একই রকম দেখছি।

—স্যার, আমায় ক্ষমা করুন। আপনারটা স্পেশাল কলম, এতে আপনার নাম লেখা...

—স্পেশাল! নাম লেখা? দেখি তো?

কলমটা নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে দেখে বললেন, এত বোধহয় কোম্পানীর নাম। আমার নামের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি তো আগে লক্ষ্যই করিনি। এটা তুমি ফেরত দিতে এলে? নাঃ, এটা তুমিই রাখ।

—স্যার, আপনি আমাদের ইস্কুলে আর আসবেন না! আপনি রাগ করেছেন আমাদের ওপর.....

আমি আর বলতে পারলুম না, মুখটা নিচু করলুম।

স্যার বললেন, আমি দিল্লিতে একটা কাজ পেয়েছি, সেখানে চলে যেতে হচ্ছে। একি বরুণ, তুমি কাঁদছ? তুমি এই রাত্রে.....

BanglaBook.org

স্যারও থেমে গেলেন হঠাৎ। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, আমি তো আসব মাঝে মাঝে। যখনই কলকাতায় ফিরব, তোমরা এস দেখা করতে..

আমার কান্না থেমে গেছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম স্যারের দিকে। ওনার মতো কড়া মানুষও যে আমাদের মতন কাঁদতে পারেন, তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

সেদিনই বুঝলুম, মানুষকে নতুন নতুন ভাবে চেনা যায়।

BanglaBook.org

সেই অদ্ভুত লোকটা

এক একটা মানুষের কিছুতেই বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। ঠিক এই রকমই একটা লোক বসে থাকে পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রত্যেক শনিবার। লোকটি পরে থাকে একটা সরু পা-জামা আরা একটা রঙ-চঙে জোব্বা। মুখে কাচা-পাকা দাড়ি। চোখে কালো চশমা, মাথায় একটা চ্যাপ্টা টুপি।

গনগনে রোদের মধ্যেও লোকটি পার্কের বেঞ্চে দুপুরবেলা বসে থাকে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঘাসের দিকে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দীপু মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাস ময়দানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। লোকটিকে দেখে দীপুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একই রকম পোশাক, প্রত্যেক শনিবার ঠিক একই জায়গায় বসে কেন এই মানুষটি? সব সময় ও একলা থাকে, কেউ ওর পাশে বসে না।

একদিন ছুটির পর বৃষ্টির মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছে দীপু। পার্কের রেলিং টপকে দৌড় লাগাতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে ছড়িয়ে পড়া বইপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় দেখল, একটু দূরের বেঞ্চে সেই দাড়িওয়ালা, কালো চশমা পরা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল। দীপুর এখন মোটেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লোকটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই লোকটাই বা শুধু শুধু এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে কেন?

দীপুর কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে।

লোকটি বলল, ইস্টুম, কিস্টুম, দ্রুখ্ দ্রুখ্!

এ আবার কি রকম ভাষা? এই লোকটা কি কাবুলিওয়ালা নাকি? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। লোকটির রোগা-পাতলা চেহারা। দীপু কখনো রোগা কাবুলিওয়ালা দেখেনি।

দীপু বলল, কেয়া? হাম নেই জানতা।

লোকটা এবারে দুটো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল, হিন্দি? বাংলা?

দীপু বলল, বাংলা।

এবারে লোকটা ভাঙাভাঙা উচ্চারণে বলল, বেশ কথা। হামি বাংলা জানে! এই লিজিয়ে খোকাবাবু, চকলেট খাও।

BanglaBook.org

লোকটা জোব্বার পকেট থেকে একটা আধভাঙা চকলেটের টুকরো বার করে দীপুর দিকে এগিয়ে দিল।

দীপুর হাসি পেল। লোকটা কি তাকে ক্লাস সিক্স-সেভেনের ছেলেদের মতন বাচ্চা ছেলে পেয়েছে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো চকলেট খাইয়ে তারপর চুরি করে নিয়ে যাবে? দীপু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ইচ্ছে করলে এই রোগা লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে।

দীপু বলল, আমি চকলেট খাব না। আপনি আমায় ডাকলেন কেন?

লোকটি চকলেটটা নিজের মুখে ভরে দিয়ে বলল, তুম্হার নাম তো দীপক মিত্রা আছে, তাই না?

দীপু একটু অবাক হল। লোকটা তার নাম জানল কি করে? লোকটা তার সঙ্গে ভাব জমাতেই বা চাইছে কেন?

তবু সে বলল, মিত্রা নয়, মিত্র। আমি আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না। কী বলতে চান চটপট বলুন?

লোকটা হঠাৎ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ফেলল। তারপর বলল, তুম্হাকে আমার খুব ভাল লাগল। তুমি হামার বাড়িতে যাবে? বেশি দেরি হবে না। স্রেফ আধা ঘণ্টা থাকবে!

দীপুর মনে হল, এ লোকটা তো তাহলে সত্যিই ছেলেধরা।

দীপুদের স্কুলের কাছে বসে থাকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের নিয়ে যেতে চায়।

দীপুদের স্কুলের ক্লাস-এইটের ছেলে অর্ণব সরকার গত মাসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকেও কি এই লোকটা নিয়ে গেছে নাকি?

দীপুর কিন্তু একটুও ভয় হল না। সে বলল, আমাকে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবেন কেন? আমি মাছ খাই না, শুধু মাংস খাই। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ এক সঙ্গে মেখে খাই। দুধ আর কোকো মিশিয়ে খাই। এসব খাওয়াতে পারবেন?

লোকটা হ-হা করে হেসে উঠে বলল, বেশ তো, হামি তুমাকে মুরগ-মশল্লাম খাওয়াব। ঠাণ্ডা লস্যি খাওয়াব, যদি তুমি একটা কাম করতে পার।

ধ্যাত্! বলে দীপু আবার চলতে শুরু করল। লোকটা তখনও হাসতে লাগল জোরে জোরে।

দীপু আর পেছন ফিরে তাকাল না।

BanglaBook.org

একটুখানি যেতে না যেতেই কোথা থেকে একটা মস্ত বড় কুকুর তেড়ে এল দীপুর দিকে। গলায় বেল্ট বাঁধা একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান। কারুর বাড়ির পোষা কুকুর, হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে।

দীপু এমনিতে কুকুর দেখে ভয় পায় না। কিন্তু এই কুকরটা তেড়ে আসছে তার দিকেই। পার্কে আর কোনো লোকজন নেই। কুকুরের সঙ্গে ছুটেও পারা যাবে না। দীপু তাড়াতাড়ি আর একটা বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

কুকুরটাও সেখানে এসে যেই দীপুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি একটা লাল রঙের দড়ির ফাঁস এসে পড়ল কুকুরটার গলায়।

দীপু দেখল সেই কালো চশমা পরা লোকটাই দড়ি ছুঁড়ে কুকুরটাকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর কুকুরটাকে টানতে টানতে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে লোকটা তার গলা থেকে ফাঁস খুলে দিল, তারপর কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল, যা, ভাগ্!

অতবড় কুকুরটা এখন দারুণ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা আবার দীপুর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, ইধারে এস দীপকবাবু।

দীপু বলল, থ্যাঙ্ক ইউ! আমার বাড়ি ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয় নেই, দীপকবাবু। এক মিনিট ঠারো, একঠো কথা বলি। তোমাকে একঠো চিজ দিতে চাই—বহুত দামি চিজ।

দামি চিজ, মানে দামি জিনিস? সেটা আমাকে দেবেন কেন?

দেব, তুমাকে হামার পছন্দ হয়েছে সেইজন্য। তার বদলে তুমাকেও একঠো কাম করতে হোবে। যাবে, হামার বাড়িতে?

না। স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে আমার মা চিন্তা করবেন। তাছাড়া আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। সামনেই আমার পরীক্ষা—

ঠিক আছে, বৃষ্টি হামি থামিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ, এক, দো, তিন....

হাতের সেই লাল দড়িটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা পাঁচ পর্যন্ত গুনে বলল, এই দেখ, বৃষ্টিকে বেঁধে ফেলেছি হামি, এবারে থেমে উঠবে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল, যদিও আগে থেকেই একটু কমে আসছিল।

দীপু হেসে বলল, আপনি বুঝি কুকুরের মতন বৃষ্টির গলাতেও দড়ি বাঁধতে পারেন? হে-হে-হে! আপনি আপনিই বৃষ্টি কমে গেছে।

BanglaBook.org

লোকটি বলল, তুমাকে হামি আর একঠো চিজ দেখাচ্ছি। তুমি এই দড়িটাতে হাত দাও!

দীপু সাবধান হয়ে গিয়ে বলল, না, আমি দড়িতে হাত দেব না!

ঠিক আছে। ওই গাছটায় হাত দাও!

কেন? তাতে কি হবে?

দিয়ে দেখ না।

লোকটা তার হাতের দড়িটা দিয়ে গাছটার গায়ে একবার মারল। তারপর দীপু সেই গাছটার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই দারুণ চমকে উঠল। দীপুর সারা শরীরটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠেছে, ঠিক কারেন্ট লাগলে যেমন হয়।

গাছের গায়ে তো কখনো কারেন্ট থাকতে পারে না। এই লোকটা তাহলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে দীপুকে !

দীপুর মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেই লোকটা বলল, এ সব ম্যাজিক নেহি, ম্যাজিক নেহি! আসলি জিনিস আছে। আর একঠো দেখবে? ওই দেখ, আসমান দিয়ে একঠো এরোপ্লেন যাচ্ছে। যাচ্ছে তো?

দীপু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় তাদের মাথার ওপর দিয়েই একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

সেই লোকটা লাল দড়িটা ছুঁড়ে দিল শূন্যের দিকে, তারপর বলল, যাঃ!

প্লেনটা অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে গা ছমছম করে উঠল দীপুর। এ কার পাল্লায় পড়ল সে! এই সময় পার্কটা এত ফাঁকাই বা কেন? লোকটা যদি দীপুকেও ওই দড়িতে বেঁধে ফেলে!

দীপু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, কি হল প্লেনটার? ধ্বংস হয়ে গেল?

না, না, ধ্বংস হবে কেন? তা হলে তো ভিতরের আদমিওলোও মরে যাবে। হামি তো কোন মানুষ মারি না। হামি শুধু তোমার আঁখ থেকে মুছে দিলাম এরোপ্লেনটাকে। শোন দীপকবাবু, হামি তুমাকে যে চিজ দেব বলছিলাম, তা কোনো আনসান্ চিজ নয়। তুমাকে দেব আস্‌লি চিজ, তা হল জ্ঞান। তুমি হামার কাছ থেকে এই জ্ঞান যদি নাও, তবে তুমি আন্ধারেও দেখতে পাবে, আগুন লাগলে হাত পুড়বে না, তিনদিন কিছু না খেলেও ভুখা লাগবে না, আরও অনেক কিছু পারবে।

ঠিক আছে, শিখিয়ে দিন!

আভি তো হবে না! দু এক ঘণ্টা টাইম লেগে যাবে। তার আগে যে তুমাকে একঠো কাম করতে হবে.

BanglaBook.org

কী কাজ বলুন?

তুমি হামাকে একটা দাওয়াই খাওয়াবে।

দাওয়াই, মানে ওষুধ?

হাঁ, হাঁ। হামার বাড়িতে সেই ওষুধ আছে। খুব দামি হেকিমি ওষুধ। পাঁচ ফোঁটা তাজা রক্ত মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈয়ার করতে হয়। চৌদ্দ-পনেরো বছরের বুকের রক্ত। তুমি সেইটুকু রক্ত হামাকে দেবে?

রক্ত!

হাঁ, মাত্র পাঁচ ফোঁটা। আসলে হয়েছে কি জান, হামি তো শুধু রোদ্দুর খাই। রোদ্দুর না থাকলেই হামি দুব্‌লা হয়ে যাই। তখন ওই দাওয়াই খেতে হয়।

আপনি রোদ্দুর খান?

হাঁ, দীপকবাবু! হামি কিছু খাবার খাই না। রোদ্দুর খেলেই হামার শরীর খুব তাজা থাকে। মুশকিল হয় এই বর্ষাকালে । এক একদিন রোদ্দুরই থাকে না, শুধু মেঘ! শুধু বৃষ্টি! তখন হামি দুব্‌লা হয়ে যাই।

আপনি তো ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে রোদ খাবেন!

আরে বাপ রে বাপ! সে কি কখনো হয়! বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কত ক্ষতি হবে। চাষ-বাস হবে না। ধান গম হবে না। কত লোক না খেয়ে মরবে। হামার একেলার সুখের জন্য কি হামি বৃষ্টি বন্ধ করতে পারি? তুমি হামায় একটু দাওয়াই খাইয়ে দাও! স্রেফ পাঁচ ফোঁটা রক্ত।

দীপু খানিকক্ষণ হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এখন আপনার বাড়ি যাব, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার মা খুব চিন্তা করবেন। আমি কাল যদি আপনার বাড়ি যাই? কাল মাকে বলে আসব যে একটু দেরি হবে।

কাল? ঠিক আসবে?

হ্যাঁ, আসব! আপনি ভাববেন না যে আমি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দিতে ভয় পাই। আমি আজকে এখন বাড়ি যাব।

তা হলে এস কালকে।

দীপু বারবার পেছনে তাকাতে তাকাতে চলে গেল পার্কটা পেরিয়ে। লোকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি নেমে গেল আবার।

BanglaBook.org

দীপু অবশ্য এই ঘটনাটা বাড়িতে কারুকে বলল না। কিন্তু লোকটা তাকে দারুণ ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে ভেবে সে খুব উত্তেজিত হয়ে রইল। পাঁচ ফোঁটা রক্ত তো অতি সামান্য ব্যাপার।

সেদিন বিকেল থেকে সারা রাত বৃষ্টি হল। পরের দিনও সেই রকম বৃষ্টি। সেদিন রবিবার, দীপুর স্কুল বন্ধ । তবু বিকেলের দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার নাম করে সে চলে এল সেই পার্কে। সেই লোকটা নেই। এত বৃষ্টির মধ্যে কেউই পার্কে আসেনি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এল দীপু।

এরপর পরপর কয়েকদিন চলল খুব বৃষ্টি। আকাশে রোদই ওঠে না। দীপুর খালি মনে হয়, সেই লোকটা কিছু না খেয়ে আছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওষুধ খাবে কি করে? অন্য কোনো ছেলে কি পাঁচ ফোঁটা রক্ত দেবে?

বৃষ্টির জন্য ইস্কুল বন্ধ রইল দু-দিন। তার পরের শনিবার দীপু ছুটির পরেই দৌড়ে এল পার্কে। লোকটা আজও বসে নেই তার সেই নিজের জায়গাটায়। কিন্তু সেই বেঞ্চটার ওপরে একটা লাল রঙের দড়ি পড়ে আছে।

এটা কি সেই ম্যাজিকের দড়ি? লোকটা দীপুর জন্যই রেখে গেছে? কিন্তু দীপু সেই দড়িটা ছুঁয়ে কিছুই বুঝতে পারল না। লোকটা তো তাকে তার সেই জ্ঞান কিংবা ম্যাজিক শিখিয়ে যায়নি।

লোকটাকে আর কোনোদিন দেখতে পায়নি দীপু।

BanglaBook.org

অন্ধকারে গোলাপ বাগানে

সাড়ে সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন, ঠিক সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে আলো নিবে গেল। এখন লণ্ঠন জ্বালতে হবে। তিনতলার ঘরে ঠিক জানালার ধারেই সুজয়ের পড়ার টেবিল। সে সেখানেই বসে রইল চুপ করে। জানালার বাইরে গোটা কলকাতাটাই অন্ধকার।

দোতলায় মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা শিবুকে বলল হারিকেন জ্বালতে। শিবু বলল, দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই এই রকম হয়। আলো নিবে গেলে তখন আর দেশলাই কিংবা টর্চ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজয়দের বাড়িতে একটা চার ব্যাটারির বড় টর্চ আছে। খুব জোর আলো হয়। সেই টর্চটা কোথায়?

সুজয় চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করল। চোখ বুজলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

কিন্তু চোখ বুজে সুজয় একটা অন্য দৃশ্য দেখল। ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতন....

...অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে টর্চ হাতে হেঁটে আসছে একজন লোক.. লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে শুধু লোকটির পায়ের সাদা কেড্‌স্ জুতো। তার প্যান্টের রঙ হল্‌দে.. লোকটি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, টর্চের আলো পড়ছে এদিক-ওদিক....

..মাঠ তো নয়, ওটা একটা বাগান। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নানারকম ফুল গাছ, লোকটি এক একটি গাছের ওপরে আলো ফেলে দেখছে, তারপর আলোটা একটি গোলাপ গাছের ওপর থেমে গেল। তিনটে বেশ বড় গোলাপ ফুল ফুটে আছে সেই গাছে.....

এবার লোকটি হাঁটু গেড়ে বসল সেই গাছটির কাছে। এখনো লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট....হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির প্যান্টের পকেটে ডান হাতটা ঢোকালো, তারপর কী যেন একটা জিনিস বার করে আনল.....

সুজয়ের বুকটা ধক্ করে উঠল..... লোকটার হাতে ওটা কি? টর্চটা মাটিতে রাখল, তারপর দু'হাত দিয়ে সেই জিনিসটা আলোর সামনে আসতেই দেখা গেল সেটা একটা গোটানো ছুরি, সেটার ফলাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঝক্‌ঝক্ করে উঠল আলোয়... দূরে একটা কুকুর ডাকছে...ডাকতে ডাকতে কুকুরটা এগিয়ে আসছে কাছে.....

—এই যে হারিকেন এনেছি।

BanglaBook.org

সুজয় চমকে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার শিবু হারিকেন নিয়ে এসেছে। সুজয়ের একটু রাগ হল। ইস্ নষ্ট হয়ে গেল ছবিটা।

একতলায় একটা কুকুর ডাকছে। এত চেনা ডাক। সুজয়ের নিজের কুকুর ডুংগা হঠাৎ ডেকে উঠেছে। ডুংগা জাতে অ্যালশেসিয়ান, খুব শান্ত কুকুর, তবু লোকে দেখলে ভয় পায়। ডুংগা সহজে ডাকে না। এখন হঠাৎ ডাকছে কেন?

—আর একটু পরে আলোটা আনতে পারলে না?

শিবু বলল, ওমা, তুমি অন্ধকারে বসে থাকবে, মা বললেন, শিগ্‌গির হারিকেনটা দিয়ে আয়। খোকাবাবু অন্ধকারে ভয় পাবে।

সুজয় বলল, হুঁ, আমি অন্ধকারে ভয় পাব, ডুংগা ডাকছে কেন রে?

—নিশ্চয়ই কোনো ছাতাওয়ালা বাবু এসেছে।

তা ঠিক। ডুংগা একদম ছাতা পছন্দ করে না। কারুর হাতে ছাতা দেখলেই বিরক্তি প্রকাশ করে।

—যা তো নিচে গিয়ে দেখে আয়!

শিবু চলে যেতেই সুজয় ভুরু কুঁচকে বসে রইল। হঠাৎ চোখ বুজে সে ওই দৃশ্যটা দেখল কেন? কোনো সিনেমায় কি শিগ্‌গিরই এ রকম কোনো দৃশ্য দেখেছে? না তো! কোনো গল্পের বইতে পড়েছে? তাও না! অন্ধকারের মধ্যে বাগানে একটা লোক, একটা গোলাপ গাছের সামনে ছুরি হাতে নিয়ে বসা—লোকটার মুখ দেখা যায়নি....লোকটা কি ছুরি দিয়ে গোলাপ গাছটা কেটে ফেলবে? কেন?

সুজয় আবার চোখ বুজল। যদি বাকি অংশটা দেখা যায়। কিন্তু এবার কিছুই দেখা গেল না। এমনি চোখ বুজলে যে-রকম হয় সেই রকম।

হারিকেনের আলোটা খুব কমিয়ে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে আবার চোখ বুজে দেখবার চেষ্টা করল সুজয়। এবারও দেখা গেল না কিছুই।

দরজার কাছে আওয়াজ হতেই সুজয় চোখ খুলে তাকাল। মাস্টারমশাই এসেছেন। হাতে একটা ছাতা।

—কী সুজয়, হারিকেনটা নামিয়ে রেখেছ কেন?

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে হারিকেনটা তুলে বলল, বসুন তপনদা, আপনি আজ আবার ছাতা নিয়ে এসেছেন?

সুজয় পড়ে ক্লাস নাইনে। তার মাস্টারমশাই সবেমাত্র এম. এ. পাশ করেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরেন আর খুব লবঙ্গ খেতে ভালবাসেন। সব সময় মুখে লবঙ্গ।

BanglaBook.org

মাস্টারমশাই বললেন, বাঃ, বৃষ্টি হলেও ছাতা আনতে পারব না? তোমার কুকুর একেবারে ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমায় চেনে এতদিন ধরে দেখছে...

এই ডুংগা যে সুজয়ের কতবড় বন্ধু তা তো মাস্টারমশাই জানেন না। ডুংগার মনে কোনো কষ্ট হলে সুজয় সহ্য করতে পারে না।

—বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি?

—আমাদের পাড়ায় তো তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের এখানেও টিপ টিপ করে শুরু হয়েছে।

সুজয় জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখলে, সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

অমনি সুজয়ের মনে পড়ল, অন্ধকার বাগানে যে লোকটা সাদা কেড্‌স পরে হাঁটছিল, তার জুতোয় কোনো কাদা ছিল না।

চেয়ার টেনে বসে মাস্টারমশাই বললেন, যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করেছ?

সুজয় খাতা বার করল। কিন্তু পড়াশুনোয় আজ তার মন বসছে না। যদিও সামনেই পরীক্ষা।

এক সময় মাস্টারমশাই বললেন, এ কি, সুজয়, মন দিচ্ছ না কেন? কতবার বলছি লিখতে, তুমি পেন্সিল হাতে বসে আছ!

সুজয় লজ্জা পেয়ে বললে ও এই যে লিখছি। কী যেন বলছিলেন তপনদা?

মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দোষ কী; এই হ্যারিকেনের আলোতে কি পড়া যায়? পাখা বন্ধ, যা গরম, পরশুতো রবিবার, সেদিন আমি দুপুরে আসব.....

এক ঘণ্টার মধ্যেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ঠিক এর পরেই সুজয়ের খাবারের ডাক পড়ে।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে রোজ সুজয় খানিকক্ষণ ডুংগাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরের এ দিকটা এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও টিপ টিপ পড়ছে। ডুংগা জলে ভিজতে চায় না। গায়ে একটু জল লাগলেই দু'কান লট্‌ পট্‌ করে গা ঝাড়া দেয় খুব জোরে। সুতরাং আজ আর ছাদে ঘোরা যাবে না।

ডুংগাকে নিয়ে সুজয় চিলেকোঠায় বসে রইল। ডুংগা একবার করে বাইরে মুখ বাড়ায়, আর নাকে বৃষ্টি লাগলেই ফিরে আসে।

সুজয়ের আবার মনে পড়ল সেই দৃশ্যটা।

সুজয় মাঝে মাঝেই চোখ বুজে এরকম সব জিনিস দেখতে পায়। কখন যে দেখবে তা ঠিক নেই। এক একদিন কিছুই দেখে না।

BanglaBook.org

দৃশ্যগুলো নানারকম হয়। পাহাড়ের পাশে সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন ছেলে.... জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ ভেঙে পড়ল মড়মড়িয়ে.....। একটু ফুলের পাপড়ি দুলছে আস্তে আস্তে আর একটা মৌমাছি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার পাশে.....! সোনারপুরে ওর ছোটমামার বাড়ির গোয়ালঘরে একটা শেয়াল ঢুকে বসে আছে, দুটো গরু ডাকছে হাম্বা হাম্বা...।

চোখ বুজে সুজয় যে দৃশ্যগুলি দেখে, তা সে কিন্তু আগে সত্যি সত্যি দেখেনি কখনো। চোখ বুজলে দৃশ্যগুলি কোথা থেকে এসে যায় কে জানে। একবার সে দেখেছিল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়িয়ে কথা বললেন শিবাজী। একেবারে সিনেমার মতন স্পষ্ট।

এসব কথা অন্য কারুকে বললে তারা বিশ্বাস করে না। ইস্কুলের বন্ধুদের দু' একবার বলতে গেছে, তারা অমনি বলেছে, যা, যা, খুব গাঁজা দিচ্ছিস।

অনেকগুলো ঘটনা মিলেও যায়। সোনারপুর থেকে ছোট মামা এসে সুজয়ের মাকে বলেছিলেন, জানো, মেজদি, পরশুদিন কী কাণ্ড। কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে আমাদের গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়ে.....।

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলেছিল, জানি, আমি জানি, দুটো গরু ভয় পেয়ে খুব ডাকছিল।

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, তুই জানিস মানে? পরশু রাত্তিরের ব্যাপার, এর মধ্যে তো কেউ আসেনি সোনারপুর থেকে।

সুজয় তবু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা সবাই মিলে তাড়া করলে...শেয়ালটা দৌড়ে পালাবার সময় একজন কে যেন লাঠি ছুঁড়ে মারল, কিন্তু ওর গায়ে লাগেনি....।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেজদি, তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আমি যেই শেয়ালের কথা বলেছি.....।

বিশ্বাস করে না, কেউ বিশ্বাস করে না। গল্প নয়, সুজয় যে ওই দৃশ্যটা সত্যিই দেখেছিল পরশুদিন, তা কারুকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তা হলে, অন্ধকার বাগানে টর্চ হাতে লোকটি যে একটা গোলাপ ফুলের গাছের সামনে বসল, সে দৃশ্যটাও সত্যি?

ওরকম গোলাপ বাগান কোথায় আছে? কলকাতায় কি থাকতে পারে? তা পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কলকাতায় বৃষ্টি পড়ছে, ওখানে বৃষ্টি নেই...। তা হলে কি দূরে কোনো জায়গায়? সোনারপুরে ছোটমামার বাড়িতে কি বাগান আছে? দু'মাস আগে সুজয় যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল, ছোটমামাদের বাড়ির সামনে

BanglaBook.org

বেগুন গাছের ক্ষেত। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানকার বেগুন গাছ তুলে গোলাপ ফুলের গাছ হতে পারে? নাঃ!

নিচে নেমে এসে সুজয় মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, আমাদের চেনাশুনো কারুর বাড়িতে ফুল বাগান আছে? এত বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে?

মা অবাক হয়ে বললেন, ফুল বাগান? কাদের ফুল বাগান আছে? হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সুজয় বললে, না, এমনি.....।

তিনতলার ঘরে সুজয় একলা শোয়। ঘুমোবার আগে সুজয় চোখ বুজে অনেক চেষ্টা করল সেই দৃশ্যটা আর একেবার দেখার। কিন্তু একবার স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর যেমন জোড়া লাগে না, সেইরকম সেই দৃশ্যটাও আর ফিরে এল না।

সকালবেলা মা সুজয়কে ডাকতে এসে দেখলেন, সুজয়ের ঘুমন্ত মুখে কী রকম যেন একটা অস্বস্তির ভাব নেমে আসে। ভুরু দুটো কুঁচকানো যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কিছু চিন্তা করছে।

একটু কিছু অন্য রকম দেখলেই মায়েরা প্রথমেই ভাবেন, ছেলের জ্বর হয়েছে কি না।

মা সুজয়ের কপালে হাত রাখলেন। না, জ্বর নেই তো।

—এই সুজয় ওঠ্।

দু'বার ডাকতেই সুজয় চোখ মেলল।

—হ্যাঁ রে, তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি ভাবছিলি?

—কই, কিছু না তো?

ঘুমের মধ্যে ভুরু কুঁচকেছিলি কেন? কোনো বাজে স্বপ্ন দেখেছিলি বুঝি।

সুজয়ের কিছু মনে নেই। অনেক স্বপ্ন পরদিন সকালে উঠে আর মনে পড়ে না। কিন্তু সুজয় জেগে চোখ বুজে যে দৃশ্যগুলো দেখে, সেগুলো তার ঠিক মনে থাকে।

সুজয়ের স্কুল সাড়ে দশটায়। বাবা অফিসে যাবার সময় সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান বলে সুজয়কে বাবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেইজন্য সকালের জলখাবার খেয়ে নেওয়ার পর একঘণ্টা পড়তে না পড়তেই তাকে যেতে হয় স্নান করতে।

পুরোনো আমলের বাড়ি তো, তাই সুজয়ের ঘরটা বিরাট। এই স্নানের ঘরটা সুজয়ের খুব ভাল লাগে। দরজাটা বন্ধ করলে তখন একা একা, নিরিবিলি লাগে। এখানে অনেক কিছু চিন্তা করা যায়।

BanglaBook.org

অবশ্য বাথরুমে বেশিক্ষণ কাটাবার উপায় নেই সকালে। বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তিনি তাড়া দেবেন।

শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সুজয় তার তলায় দাঁড়াল। শাওয়ারের জল খুব তোড়ে পড়বার সময় আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই সুজয় আর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

...একটা খুব বড় বাড়ি, দোতালায় টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো মতন লোক খুব রাগারাগি করছেন। দূরে দু'তিনজন লোক কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে...বুড়ো লোকটির বুকের লোম পাকা, শুধু একটা ধুতি পরা, বেশ বড় গোঁফ, হেঁড়ে গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার চাবি কোথায়? আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

সুজয় চোখ খুলে ফেলল। আর কিছু দেখা গেল না। ওই বুড়োলোকটি কে? ওই বাড়িটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। তবু সে কেন দেখল ওই দৃশ্যটা? কোথায় কার চাবির গোছা হারিয়ে গেল, তা নিয়ে সুজয়ের মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু ভুলতে চাইলেও সুজয় ভুলতে পারে না। খেতে বসেও সুজয়ের কানে বাজে সেই বুড়ো লোকটির চিৎকার, আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল এক পিরিয়ড্ পরেই। ডিবেট কমপিটিশানে ক্লাশ টেনের একটি ছেলে ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ি চলে এসে সুজয় শুয়ে রইল নিজের ঘরে। এরকম দুপুর বেলা সুজয় কোনদিন শুয়ে থাকে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় কিংবা গল্প করে। বৃষ্টি হলেও ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে।

কিন্তু সুজয়ের শরীর ভাল লাগছে না মনটা একটু যেন ব্যথা ব্যথা করছে। সুজয় শুয়ে রইল চোখ বুজে। এখন আর সে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ছে বারবার। কে ওই বুড়ো লোকটা? সুজয় কোনদিন ওইরকম লোককে দেখেনি, খুব জোর দিয়ে বলতে পারে।

একটু পরেই তার বন্ধু অভিজিৎ এসে হাজির। অভিজিৎ অবশ্য অন্য স্কুলে পড়ে। আশ্চর্য, তাদের স্কুল কাল ও আজ ছুটি। ওদের স্কুলের একজন টিচার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিজিৎ উত্তেজিত ভাবে বললে, এই দমদম যাবি?

সুজয় বলল, দমদম হঠাৎ? দমদম যাব কেন?

—দমদমে আমার মামার বাড়ি। বেশ আজ ওখানে থাকব, কাল চলে আসব।

BanglaBook.org

—কাল ইস্কুল যাব না?

—ধুত্ কাল তো রবিবার।

—রবিবার দুপুরে আমার মাস্টারমশাই আসবেন বলেছেন যে।

—কাল সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসব। বাবা অফিসের কাজে বহরমপুর যাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যাবেলা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দমদমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। সকালে আমরা ফিরে আসব বাসে করে। ওই বাসে করে ফিরে আসার ব্যাপারটা শুনেই সুজয় বেশি উৎসাহ বোধ করছে। অনেকক্ষণ বাসে চাপতে সুজয়ের খুব ভাল লাগে । কত রকম মানুষ দেখা যায়।

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে আগে।

অভিজিৎকে বসিয়ে রেখে সুজয় গেল মায়ের ঘরে। মা এই সময় উপন্যাস পড়েন। মায়ের পাশে বসে সুজয় খুব নরম ভাবে বলল, মা, একটা কথা বলব?

মা বললেন, পয়সা চাই বুঝি? পরশুদিন তোকে একটা টাকা দিয়েছিলুম না?

—না, মা, পয়সা না। অভিজিৎ এসেছে, ও বলছিল....।

একটু পরেই মা রাজি হয়ে গেলেন।

ওরা বেরিয়ে পড়ল বিকেল পাঁচটার মধ্যে। অভিজিৎদের মামার বাড়ি নাগেরবাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। পৌঁছতে বেজে গেল সাড়ে ছটা। তখন সন্ধে নেমেছে।

সুজয়ের বাবা গাড়ি থেকে নামলেন না, গেটের কাছে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গাড়ি ঘুরিয়ে।

মস্ত বড় লোহার গেট, সামনে খানিকটা লন, সামনের দিকে শুরকি বিছানো রাস্তা। গেটটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল, অমনি দোতলা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, কে?

অভিজিৎ বলল, আমি।

—আমি কে?

—আমি অভিজিৎ ....খোকন। দাদু, আমি খোকন, বালিগঞ্জ থেকে এসেছি।

—ও খোকন? আয়! কার সঙ্গে এলি?

কারুকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না., শুধু কথা শোনা যাচ্ছে।

দুজনে চলে এল বৈঠকখানায়। খুব বড় বাড়ি, কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একজন বয়স্কা মহিলা একতলার একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে খোকাবাবু যে! এস, এস। সঙ্গে এটি কে?

BanglaBook.org

অভিজিৎ বললে, আমার বন্ধু সুজয়। বড় মাসিমা, কেমন আছ তুমি?

অভিজিৎ সেই মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজয়ও প্রণাম করল।

যদিও এটা অভিজিতের মামার বাড়ি, কিন্তু মামারা এখানে কেউ নেই। এক মামা বিলেতে, আর এক মামা দিল্লিতে। এখানে থাকেন অভিজিতের দাদু আর দিদিমা। আর এই মহিলাটি দূর সম্পর্কের মাসি।

অভিজিৎকে সেই মাসি তাঁর ঘরে নিয়ে বসাতে চাইছিলেন, অভিজিৎ বলল, বড় মাসি, আগে দাদুকে প্রণাম করে আসি। মাসিমা বললেন, দেখিস, সাবধান। কর্তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। লম্বা টানা বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো লোক। তাঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুজয়। তার বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ শব্দ হচ্ছে। জীবনে এমন অবাক সে কখনো হয়নি।

এই তো সেই লম্বা বারান্দা। আর এই বুড়ো লোকটিকেই তো সে কাল দেখতে পেয়েছিল বাথরুমে চোখ বুজে। ইনিই তো চাবি হারিয়ে গেছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বলল, কি হল, দাঁড়ালি কেন? উনি আমার দাদু।

সুজয় আর অভিজিৎ গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে। অভিজিৎ বলল, দাদু, এ আমার বন্ধু সুজয়।

দাদু বললেন, তোর মা কেমন আছে? সে এল না কেন? আজ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! আমার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, সিন্দুকের চাবি, ট্রাঙ্কের চাবি, ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, সব এক সঙ্গে ছিল।

সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে এখনো। সে জানত, ঠিক মিলে যাবে, চাবির কথা মিলে যাবেই। অভিজিতের দাদুর বুকের সব চুল পাকা।

অভিজিৎ বলল, কখন হারাল দাদু?

এই তো সকালবেলা। কী কাণ্ড দ্যাখ্ না। নিশ্চয়ই কেউ বদ মতলবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে দুদিন কোথাও যাইনি, চাবি কি করে হারাবে?

পাশের ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন অভিজিতের দিদিমা। তিনি বললেন, খোকন এসেছিস। দ্যাখ না কী কাণ্ড! চাবি হারিয়ে ফেলে তোর দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দাদু বললেন, হবে না? কেউ যদি ওই চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে? সারাদিন ধরে আমি পাহারা দিচ্ছি, ঘর থেকে একেবারে বেরুই না। কিন্তু এরকমভাবে ক'দিন যাবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, নতুন চাবি করানো যায় না?

BanglaBook.org

দাদু বললেন, কতকাল আগেকার চাবি, ও কি এখন পাওয়া যায়? ব্যাঙ্কে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে অনেক দামি জিনিসপত্র রয়েছে....।

দিদিমা বললেন, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আর কী করবে তার। আয় তোরা ঘরে আয়। এই ছেলেটি কে? তোমার নাম কি?

সুজয় কথা বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না। অতি কষ্টে সে নিজের নামটা বলল।

দিদিমা ডাকলেন, রজত, রজত!

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটি ফিটফাট চেহারার ছেলে এল সেই ডাক শুনে।

দিদিমা বললেন, রজত এদের জন্য মিষ্টি এনে দাও। ঠাকুরকে বল মাংস রাঁধতে। ওরা আজ রাত্রে এখানে খাবে।

ছেলেটি চলে গেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, দিদিমা, ও কে? ওকে তো আগে দেখিনি?

দিদিমা বললেন, সেই যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওকে এনেছি। ও সম্পর্কে আমার এক কাকার ছেলে। লেখাপড়া বেশি শেখেনি, ও সবে একটা হোটেলে কাজ করছিল। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

মিষ্টি আর জল-টল খাবার পর সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ গেল ছাদে। মস্ত বড় ছাদ। বাড়ির চারপাশটা ফাঁকা। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না। নারকোল গাছের পাতায় হাওয়ার সর সর শব্দ হচ্ছে।

—কী রে তুই কোনো কথা বলছিস না কেন?

—কি বলব?

—একেবারে গুমরে আছিস যে? তোর ভাল লাগছে না?

—হ্যাঁ।

সুজয় তখনও ভাবছে, সে যে আজ এখানে আসবে, তার তো কোনো ঠিক ছিল না আগে থেকে। তবু সে এই বাড়িতে তার বন্ধুর দাদুর চাবি হারানোর দৃশ্যটা দেখল কেন আগে থেকে! দেখেই বা কি লাভ হল?

অভিজিৎ বলল, এই বাড়ির পেছন দিকটায় একটা বেশ বড় বাগান আছে। দেখতে যাবি?

সুজয় চমকে উঠে বলল, বাগান?

—হ্যাঁ। খুব চমৎকার বাগান। দাদুর খুব ফুল গাছের শখ। যাবি?

—এক্ষুণি।

BanglaBook.org

অভিজিৎ একটা টর্চ চেয়ে নিল দিদিমার কাছ থেকে। সুজয়ের আর ধৈর্য থাকছে না, সে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে বাগানটা দেখতে চায়।

ঠিক সেই বাগানটাই কিনা তা বুঝতে পারল না সুজয়। অন্ধকারের মধ্যে সুজয় শুধু টর্চের আলোয় কয়েকটা গাছ দেখেছিল। সেটা যে-কোনো বাগান হতে পারে! তা ছাড়া, সেই বাগানে ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে অভিজিৎ-এর দাদুর চাবি হারাবার সম্পর্ক কি?

অভিজিৎ-এর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সুজয় প্রত্যেকটা ফুল গাছের ওপর আলো ফেলতে লাগল। বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। সুজয় দেখতে পেল, একটা গোলাপ গাছে ফুটে আছে তিনটে গোলাপ ফুল।

সাদা গোলাপ। কোনো সন্দেহ নেই, কাল এই গোলাপ গাছটাকে দেখেছিল সুজয়।

অভিজিৎ-এর হাতে টর্চটা দিয়ে সে বলল, তুই একটু এগো, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বলল, সামনেই একটা সুন্দর বেঞ্চ আছে, চল, ওখানে বসে বেঁধে নিবি।

—তুই বেঞ্চে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

অভিজিৎ এক পা এগোতেই সুজয় বসে পড়ল গোলাপ গাছটার পাশে।

গোলাপ গাছ ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা সব সুদ্ধু উঠে এল মাটি থেকে।

সুজয় কখনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছেঁড়ে না। গাছকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়। কিন্তু এই গোলাপ গাছটার শেকড় কাটা।

গাছটা তুলে ফেলে তার শেকড়ের কাছটার গর্তে হাত ঢোকাল সুজয়। সে যা ভেবেছিল তাই। সেখানে রয়েছে সুজয়ের দাদুর চাবির গোছা।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা পায়ের শব্দ পেয়েই সুজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সে দেখতে পেল একটা সাদা কেড্‌স জুতো। তারপর খাঁকি প্যান্ট। এই সেই রজত।

রজত সুজয়কে মারবার জন্য একটা হাত তুলেছিল, তার আগেই সুজয় চেঁচিয়ে উঠল, অভিজিৎ, অভিজিৎ! আমি চাবি খুঁজে পেয়েছি। রজত থমকে দাঁড়াল। তারপরই পেছন ফিরে লাগাল দৌড়। এরপর রজতকে আর দেখতেই পাওয়া যায়নি।

অভিজিৎ কাছে এসে বলল, চাবি? দেখি, দেখি! সত্যিই তো! তুই কি করে পেলি?

সুজয় বলল, এমনি, আমার পায়ে হঠাৎ হোঁচট লাগল। আমি দেখলাম, একটা চাবির গোছা—।

তারপর সুজয় মন দিয়ে সেই গোলাপ গাছটাকে আবার পুঁতে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যি কথা তো বলে লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

BanglaBook.org